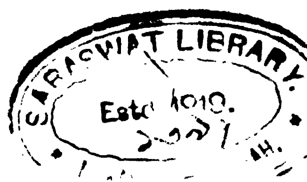
বেড নং ৩৯

৯.৩.৭৪



বেড নং ৩৯

১

'গহনার মধ্যে বালা—কুটুমের মধ্যে শালা।'

সুতরাং শ্রীযুক্ত যদুনাথ বাবুর শ্যালক অবিনাশ সেদিন প্রাতঃকালে যখন ভগিনীর গৃহে আসিয়া দেখা দিল, তখন যদুবাবু হর্ষে গদ-গদ হইয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ কুটুম্ব অবিনাশকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া কহিল—

য়্যাদ্দিন পরে আমার কপাল
ফিরেচে,
'বাড়ীর কত্তাটি—কত্তাটি' বোলে
গিন্নী—ডেকেচে।

আজ দেখচি, আমার ভাগ্যের মহা জোর। অবিনাশ আজ হঠাৎ পথ ভুলে নাকি হে? বলিয়াই একহাত

মস্তকোপরি এবং আর একহাত কোমরে দিয়া স্থূল দেহ দোলাইয়া এক পাক নাচ নাচিয়া লইলেন।

পঙ্কজিনী কুটনা কুটিতেছিল। স্বামীর এই নেহাৎ সেকেলে ধরণের রসিকতা দেখিয়া, কপাল কোঁচকাইয়া বলিল—এই জন্যেই কেউ তোমায় মানে না। দাদার চেয়ে তুমি খুব কম হলেও দশ বছরের বড়, কিন্তু এই জন্যেই দাদাও তোমায় মানে না, দাদার ছেলে-মেয়েরাও মানে না।

যদুনাথবাবু সেকালের পাঠশালার পণ্ডিতের মত, মুখখানাকে অসম্ভবরূপ বিশ্রী এবং ভীষণ করিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন—হ্যাঁরে অবিনাশ, তুই আমাকে মানবি না?

অবিনাশ তাহার বুক-পকেট হইতে সেণ্ট-মাখানো বাহারে বর্ডার দেওয়া রুমালখানা বাহির করিল এবং তাহা নিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে কহিল—খুব মানবো, দাদা। অন্ততঃ আজ যে কাজের জন্যে এসেছি, তাতে আপনাকে ভয়ানক মানবো।

পঙ্কজিনী কহিল—চা খেয়ে বেরিয়েচ দাদা, না করব?

চা নয়; একটু কোকো যদি পারিস, কর্, বলিয়া

অবিনাশ যদুবাবুর হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

স্ত্রী হিসাবে যদুবাবুর কাছে পঙ্কজিনীর আদরও বড় কম নয়। যেহেতু পঙ্কজিনী তাঁহার তৃতীয় পক্ষের পরের পক্ষ। প্রথম পক্ষের 'অরিজিন্যাল' স্ত্রী গত হইলে তিনি দ্বিতীয় পক্ষকে ঘরে আনেন। দ্বিতীয় পক্ষও যখন তাঁহাকে বুড়া বয়সে কাঁদাইয়া চলিয়া যান, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন যে, তাঁহার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তিনি 'নারী রক্ষা সমিতি'কে দানপত্র লিখিয়া দিয়া, সংসারত্যাগী বিরাগী হইয়া দেশে-দেশে ঘুরিবেন আর সমস্ত জীবন বিরাজের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিবেন। তাহার পর মাস তিন-চার গত হইলে, তিনি মনে করিলেন, পুরুষ হইয়া পুরুষত্ব হারাইবেন না; দীর্ঘশ্বাস ফেলিবেন না; কাঁদিবেন না; ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক! তিনি পুনরায় বিবাহ করিবেন। সুতরাং তিনের আপদ বারটা তাঁহাকে কলাগাছের সহিত বিবাহ করিয়া, তবে চতুর্থপক্ষ পঙ্কজিনীকে ঘরে আনিতে পারিয়াছেন।

এমতে পঙ্কজিনী তাঁহার শুধু আদরের নয়, তাঁহার সাগর-ছেঁচা রতন, তাঁহার 'সাতরাজার ধন—এক মাণিক,' তাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহার নয়নের মণি। পঙ্কজকে তিনি

নিমেষের জন্য চোখের আড় করিতে চাহেন না। নিষ্ঠুর সংসারের অনাবশ্যকীয় কাজ-কর্ম্মের জন্য সময় সময় তাহাকে চোখের আড় করিতে বাধ্য হইলেও তিনি তাহাকে কখনই মনের আড় করেন না। তাঁহার হৃদি-সরোবরে আলো করিয়া ফুটিয়া থাকে প্রফুল্ল পঙ্কজ যত্ন তরঙ্গ হিল্লোলে তাহা হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে। কিন্তু কালের ঘূর্ণীবাত্যায় যদি পঙ্কজকে অসময়ে কোন বিষম দুর্দ্দিনে—। ইহার পর যতুবাবু আর ভাবিতে পারেন না। তিনি পঙ্কজের কাছে ছুটিয়া গিয়া ডাকেন—পঙ্কজ, পঙ্কজ, পঙ্কজিনী! পঙ্কজিনী ইহাতে বিরক্ত হইয়া যদি বলে—আচ্ছা, তুমি কী বল দেখি? ভীত কাতর যতু-বাবু উত্তরে বলেন,—আমি গরু, পঙ্কজ, আমি ঘর-পোড়া গরু! সিঁদূরে মেঘ দেখলেই ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে।

অবিনাশ এ-হেন পঙ্কজের দাদা বলিয়াই, আজ প্রাতঃকালে যতুবাবু যে কাণ্ড করিয়া বসিলেন, তাহা আশ্চর্য্য এবং অসাধারণ এবং অপূর্ব্ব। অর্থাৎ ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া অবিনাশ, তাহাদের পাড়ার বারোয়ারী দুর্গোৎসবের কিছু চাঁদার জন্য যখন ভগিনী-পতিকে ধরিয়া বসিল, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে দেরাজ খুলিয়া যতুবাবু একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির

করিলেন। কিন্তু অবিনাশের যে বুদ্ধি-ভ্রংশ ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেন না, সে পাঁচ টাকা না লইয়া 'পাঁচ দ্বিগুণে দশ' টাকার দাবী করিয়া বসিল।

কিন্তু পঙ্কজের দাদা হইলেও সম্ভব অসম্ভবের একটা সীমা আছে। যদুবাবু কহিলেন,—ভাই রে, আমার ওপর তুই নিষ্ঠুর হ'স নি। আমার কি খরচের দিন আসছে বল্ দেখি!"

অবিনাশ কহিল—আপনি কী ফের আর একটা বিয়ে করতে যাচ্ছেন না কি?

বিয়ে কি রে? পঙ্কজের যে এই মাসেই—তোমার গিয়ে—।

ওঃ! প্রসব হবে বলছেন। সেই জন্যেই ত আমাদের পূজায় এবার আপনার কাছ থেকে দশ টাকার কম চাঁদা কিছুতেই নেব না। দিন শীগ্গির!"

কিন্তু শীগ্গীর ত নয়ই, বহু বিলম্বে বহু অনুরোধ-উপরোধ জোর-জবরদস্তীর পরও যদুবাবুকে পাঁচের উপর উঠাইতে অবিনাশ সক্ষম হইল না এবং সক্ষম না হইয়া তাঁহার নোটখানি ফেরত দিয়া এই বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিল যে, পাঁচের দশগুণ টাকা সে তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিবে তবে ছাড়িবে।

২

নমস্কার ডাক্তারবাবু।

নমস্কার! কি চাই আপনার?

বালিগঞ্জ সেবাশ্রম: সকালবেলা যতুবাবু সেবাশ্রমের সামনেকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপস্থিত ডাক্তার বাবুটিকে নমস্কার করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

কি চাই আপনার?

আজ্ঞে, ডেলিভারী কেশ।

পেইন্ আরম্ভ হয়েছে কি? ঐ সামনের ঘরে নিয়ে যান, ওখানেই মিস্ বসাক ব'লে যিনি আছেন, তিনিই···

আজ্ঞে, তার হয় ত এখনও দিন কতক দেরী আছে। হয় ত এই মাসের শেষের দিকে...আমি দু'একটা বিষয়ে জানতে এসেছি, অনুগ্রহ ক'রে যদি......

বলুন, কি জানতে চান।

প্রসবের পর ক'দিন এখানে থাকতে হয়?

সাত দিনের দিন আমরা ছেড়ে দি। তবে আজ-কাল যে রকম রুগীর ভীড় আর স্থানাভাব, তাতে যদি.....।

আচ্ছা, 'পেয়িং ওয়ার্ড' আর 'নন-পেয়িং ওয়ার্ডে' সেবা-যত্ন দেখা-শোনার কি কিছু ইতরবিশেষ......

ইতরবিশেষ কিছু নেই, তবে 'পেয়িং ওয়ার্ডে' প্রসূতিকে একটা ছোট ঘর একলার জন্যে দেওয়া হয়। 'নন-পেয়িং' এক ঘরে ১০।১১ জন থাকে।"

সেইটেই ত সুবিধে। বেশ সকলে মিলে গল্প-গাছা ক'রে সময় কাটাতে পারে। আচ্ছা, 'পেয়িং ওয়ার্ডে' রোজ কত ক'রে দিতে হয়?

"তিনটাকা। তা' ছাড়া, ডেলিভারী ফি দশ টাকা দিতে হয়। "নন-পেয়িং" হ'লে এক পয়সা দিতে হয় না।

যদুবাবু নমস্কার করিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পিছন হইতে কে আসিয়া টপ্ করিয়া দুই হাতে তাঁহার চোখ চাপিয়া ধরিলেন ও কয়েক সেকেণ্ড পরে চোখ ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন—খবর কি যোদ্দা, এ স্থানে আগমনের—

ইনি সেবাশ্রমের একজন ডাক্তার।

আগমনের কারণ কতক সবিস্তারে এবং কতক সংক্ষেপে যতুবাবু তাঁহাকে বর্ণন করিলে তিনি বলিলেন —অত পয়সা থাকতে, বউদিকে তুমি সেবাশ্রমে— না দাদা, এটা তোমার পক্ষে ঠিক হয় না। তা' ছাড়া, সাত-সাতটা দিন তুমি যে বৌদিকে ছেড়ে একলা আঁধার ঘরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাটাবে, এতটা দুঃসাহসও তোমার করা কিছুতেই উচিত হয় না।

এই রহস্যের ঠিক উত্তর কিছু একটা যোগাইতে না পারিয়া, যতুবাবু মুখভঙ্গীর সহিত নেপাল ডাক্তারের পিঠে ছোট্ট একটা কিল মারিয়া, সহাস্য মুখে তাহার কথার প্রথম অংশের উত্তর দিলেন—ভাই, বাড়ীতে এ অবস্থায় দেখবার শোনবার লোক ত আর কেউ নেই। বাপের বাড়ী যে পাঠিয়ে দেবো, সেখানেও তথৈবচ। তাই এখানে দেবার মৎলব করছি। এমন সেবা-যত্ন ত আর বাড়ীতে হবে না! এই বলিয়া যতুবাবু বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

কিন্তু ইহার মাত্র দুই দিন পরেই যে পঙ্কজিনীকে লইয়া তাঁহাকে যে এখানে আসিতে হইবে, ইহা যতু বাবু একেবারেই ভাবেন নাই।

সে দিন ডাক্তার নেপাল বাবু তখন 'ডিউটি'তে

ছিলেন ; কহিলেন—বোদ্‌দা, বরাবরই খাওয়ানোটা আমাদের ফাঁকি দিয়ে এসেছ। প্রথম বিয়ের খাওয়ানোর কথা না হয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের বেলাতেও আমাদের ফাঁকি দিলেন। তৃতীয় পক্ষ—কলাগাছকে বিয়ে করে আমাদের কলা খাওয়ালেন। তারপর কবে যে চতুর্থ বৌদিকে ঘরে আনলেন, তা জানতেও পারলুম না। কিন্তু এবার খোকা হ'লে আর ছাড়ান নেই। ভাল ক'রে একদিন—বুঝেছেন ত ?

যদুবাবু হি-হি করিয়া হাসিয়া কহিলেন, আরে ভাই, আমোদ ক'রে খাবে, তাতে আর কি। কিন্তু বড় চিন্তিত হয়েই আছি। আমার ওয়াইফের এই প্রথমবার কি না। যতক্ষণ না নির্ব্বিঘ্নে পো-পোয়াতি—।

যদুবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে একজন নার্স আসিয়া নেপালবাবুকে সংবাদ জানাইল—খোকা হয়েছে।

নেপাল ডাক্তার লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন—বোদ্‌দা, খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করুন। এবার আর কিছুতেই ছাড়ান নেই। আর একটি ডাক্তারবাবু এই সময় ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন—

কি হে, এত স্ফূর্ত্তি কিসের ?

নেপাল ডাক্তার কহিলেন, "এঁকে চিনে রাখুন, মিষ্টার ব্যানার্জ্জি। ইনি হলেন আমাদের যোদ্‌দা। বৌদি আমাদের আজ থেকে সাত দিন এখানেই থাকবেন। সুতরাং যোদদারও এই সাত দিনের জন্যে এখানে থাকবার কোন-রূপ যদি একটা সুবিধে—

আরে, যদু বাবু যে! মেয়েছেলে কেউ এখানে আছে না কি? প্রশ্ন করিতে করিতে সেবাশ্রমের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে সংক্ষেপে কিছু একটা বলিয়া একটু তফাতে আসিয়া দাঁড়াইলে এক জন বুড়া চাপরাশী সেলাম করিয়া যদু বাবুর সামনে আসিয়া কহিল—আরে মোহারাজ যোদ্‌হুবাবু, কোই রোগী-উগী আপকা ঘরকো হিঁপর্ হোয়, মালুম হোতা।"

সেবাশ্রমের বহুদিনের উড়িয়া চাকর বেহারী, দূর হইতে যদু বাবুকে দেখিতে পাইয়া হাতের ঝাড়নখানা কাঁধে ফেলিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিল— হস্‌পতালে কন্ কাম লেগে আছন্তি বাবু?

কি সর্ব্বনাশ!

যদুবাবু ফটকের বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন! তাঁহার অন্তরে তখন হর্ষ, লজ্জা, ভয়, উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতা যুগপৎ উদয় হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল।

তিনি জানিতেন, সন্ধ্যা সাতটার পর ভিতরে রোগীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। পাঁচটা হইতে সাতটা দেখা করিবার সময়। আজ ত পঙ্কজের সহিত তাঁহার দেখা করিবার আর কোনই উপায় নাই। যদু বাবু বিষণ্ণচিত্তে এক পা এক পা করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সে রাত্রে আনন্দে ও উৎকণ্ঠায় তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না। শয্যায় শয়ন করিয়া সারারাত্রি পঙ্কজিনী ও নবজাত শিশুটির কথা ভাবিতে লাগিলেন—খোকাটা নিশ্চয়ই পঙ্কজের মত ফুট্‌-ফুটে হয়েছে। হয় ত শুয়ে শুয়ে সে তার ছোট, কচি-কচি হাত-পা নেড়ে খেলা করেছে—ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ! পঙ্কজ ত কখনও ছেলে মানুষ করে নি! খোকাটাকে নিয়ে একলা কি যে সে কচ্ছে! —তাই না হয় সকালবেলা এক ঘণ্টা ক'রে দেখা করবার সময় কর; তা নয়—সেই বিকেলে ৫টা থেকে ৭টা। যেমন হাসপাতাল, তেমনি তার ব্যবস্থা। নেপাল ডাক্তারটা ভারি মুখ-ফোঁড়। যাক, সাতটা দিন কোনও রকমে কেটে গেলে বাঁচা যায়। খোকার নাম রাখা হবে কি? পঙ্কজের ছেলে পঙ্কজকুমার—না না, ও সব নয়—বেশ একটা নতুন ফ্যাসানের।—পঙ্কজের বেড্ নম্বরটা

জেনে এলে হ'ত। ভোরে উঠে গিয়ে ওটা জেনে আসতে হবে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া যদু বাবু সেবাশ্রমে ছুটিলেন। যে ডাক্তারবাবুটি তখন ডিউটীতে ছিলেন, তিনি অনুসন্ধান করিয়া যদু বাবুকে জানাইলেন '—শ্রীমতি পঙ্কজিনী মিত্র, বেড নং ৩৯।'

৩

ঢং ঢঢং ঢং—ঢং ঢঢং ঢং

সেবাশ্রমে পাঁচটার ঘণ্টা পড়িল। বাহির হইতে হুড় করিয়া দর্শকের দল রোগীদের ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। যে সব স্ত্রীলোক প্রসবের জন্য আসিয়াছে, তাহাদের ওয়ার্ডেই দর্শকের ভীড় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পাঁচটার ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত ঘরে ঢুকিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক 'বেডে' যিনি আছেন, তাঁহার স্বামী দেবতাটি তাঁহার শিয়রের পাশে বসিয়া স্ত্রীটির মুখের উপর নুইয়া পড়িয়া কতই না আগ্রহ আলাপে ব্যস্ত। পবিত্র ভালবাসার কী মহান্ নিদর্শন এবং আকর্ষণ! ৫টা হইতে ৭টা মাত্র দুটি ঘণ্টা, ১২০টি মিনিট, ৭২০০ শত সেকেণ্ড। ইহার একটি সেকেণ্ড না বৃথা নষ্ট হয়। তাই এই দুর্দ্দমনীয় আবেগ। স্ত্রীকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, সকলে যেন পাঁচটার পর সেবাশ্রমের এই সব ঘরে আসিয়া দেখিয়া শিখিয়া যায়। সপ্তাহব্যাপী স্ত্রী-বিচ্ছেদের কি বিরাট তাড়ন!

কিন্তু সত্যই কি তাই? এ কি ভালবাসা? না, এর ভিতর আর কিছু আছে? হয় ত আছে। হয় ত ইহা, সারি সারি অসংখ্য শুশ্রূষাকাঙ্ক্ষীর করুণায় মুখের সৌন্দর্য্য পান করিবার পিপাসা, বা শুশ্রূষাকারিণী, নার্সদিগের লীলায়িত রূপচাঞ্চল্য উপভোগের প্রবল স্পৃহা।

ঠিক চতুর্থ পক্ষ। তথাপি যদু বাবুকে এ দোষে কেহ দোষী করিতে পারিবে না। প্রায় ৬টার সময় যদু বাবু আসিয়া মাত্র অর্দ্ধঘণ্টার জন্য বেড নম্বর ৩৯ এর পার্শ্বে—খাটের উপর পঙ্কজিনীর শিয়রের ধারে নয়—স্বতন্ত্র একখানি টুলের উপর বসিলেন।

বড় লজ্জা করে পঙ্কজ, সকলেই প্রায় এখানে জানা-শুনা। ভাল আছ ত?

হাঁ আছি, কিন্তু এখানে আমি থাকবো না। এখানকার ডাক্তারবাবুরা সকলে এত ভাল যে, তা আর বলবার নয়। বেশীর ভাগ নার্সরাও খুবই ভাল। কিন্তু ঐ যে খাটের শিয়রে শিয়রে প্রেমিক বাবুদলের ভীড়, এরা স্ত্রীকে দেখতে আসবার নামে কেবলই হাঁ ক'রে আমাদের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, তাতে আমার ভারি বিশ্রী লাগে।

সাতটা দিন একরকমে কাটিয়ে দাও। কি আর করবে, বল ? তার পর খুব মৃদুস্বরে যদু বাবু কহিলেন—প্রেমিক বাবুদের দোষ দেব কি, তোমার ঐ সুন্দর মুখের দিকে আমারও খালি খালি চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আরও দুই চারিটা কথাবার্ত্তার পর, খোকার দিকে বার বার চাহিয়া দেখিয়া, যদু বাবু চলিয়া আসিলেন।

পরের দিনও যদু বাবু ৬টার পর একবার গিয়া পঙ্কজিনীর খবর লইয়া আসিলেন। বাহিরে আসিতেই নেপাল ডাক্তার সম্মুখে। তিনি মৃদু অথচ সুতীব্র হাসি হাসিয়া কহিলেন—দাদার আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়। বৌদিদির বেডের পাশে আপনার একটা বেডের বন্দোবস্ত ক'রে শীগ্‌গিরই দিচ্ছি।

রহস্যটাকে আমল না দিয়া যদুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন —আজ বুঝি এই সময় ডিউটী ?

হ্যাঁ দাদা। ডিউটীর কি আর বিরাম আছে ? কোন দিন সকালে, কোন দিন বিকালে, কোন দিন সন্ধ্যায়, কোন দিন রাত্রে। বলিতে বলিতে নেপাল বাবু ব্যস্ত-ভাবে ওয়ার্ডের দিকে চলিয়া গেলেন। যদুবাবু ভাবিলেন, কাল একবার দেখিয়া গিয়া এ কয়দিন আর তিনি

আসিবেন না, সাত দিনের দিন আসিয়া একেবারে পঙ্কজকে লইয়া যাইবেন।

করিলেনও তাহাই। পরদিন যদুবাবু আসিয়া পঙ্কজকে কহিলেন—আর এ ক'দিন আসবো না পঙ্কজ; ক'টা দিন পরে একেবারে এসে নিয়ে যাব।

পরদিন অবিনাশ সেবাশ্রমে ভগিনীকে দেখিতে আসিল। ভগিনীপতির নিকট সে জানিয়াছিল ভগিনীর বেড নং ৩৯।

পঙ্কজিনী দাদাকে কহিল—তুমি এসেছ ভালই হয়েছে, দাদা। এখানে এই সব রুগীদের মধ্যে থাকতে আমার যেন কি রকম হচ্ছে। তুমি এদের ব'লে ক'য়ে আজই আমায় এখান থেকে নিয়ে চল।"

অবিনাশ কহিল—"আর ৪।৫টা দিন কোন রকমে কাটিয়ে দে না। তিন দিনের দিন এরা কি বাড়ী নিয়ে যেতে দেবে? আর এখন নিয়ে গেলে দাদাও হয় ত খ্যাচ্ খ্যাচ্ করবে।"

না দাদা, তুমি আমাকে নিয়ে যাও। আমাকে নিয়ে তুমি বৌবাজারে চল। দিন কতক বৌদি'র কাছে আমি থাকবো।

ঢং—ঢঙং ঢং—ঢং—ঢঙং—ঢং!

দর্শকদের কানে বিষ ঢালিয়া দিয়া ৭টার ঘণ্টা নিষ্ঠুরের মত বাজিয়া গেল। অবিনাশ পঙ্কজের কথার উত্তর দিবারও সময় পাইল না; তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসপাতালের অফিসের দিকে অগ্রসর হইল।

৪

আজ পঙ্কজিনীর সাত দিন। আজ হাসপাতাল হইতে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। গত রাত্রে যদুবাবু সমস্ত রাত ঘুমান নাই ; দিনের বেলাও ঘোরাঘুরি এবং পরিশ্রমের তাঁহার অন্ত ছিল না। খোকার জন্য দোলা, অয়েল-ক্লথ, কাগজের ফুল—দোলায় শুইয়া শুইয়া দেখিবে, এক নং এলেন-বারির ফুড—হয় ত এখন থেকেই এক আধবার খাওয়াইবার দরকার হইতে পারে ; এই সব কেনা-কাটা ; তার পর ঘর-দোর পরিষ্কার করা, বিছানা পত্র ঠিক করা ; কত কাজে তাঁহার গত কল্য কাটিয়াছে। আজ ভোর না হইতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া সাত দিনের পরিত্যক্ত রান্না ও ভাঁড়ার ঘর গুছাইয়া ঠিক করা, পঙ্কজিনীর কাপড়-চোপড়, সাবান তোয়ালে, আয়না, চিরুণী, আলতা প্রভৃতি সব যথাস্থানে ঠিক করিয়া রাখা প্রভৃতি কাজ সারিতেই বেলা ৮টা বাজিয়া গেল। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই তিনি তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে লাগিলেন। আশ্বিনের কড়া রৌদ্রে বেশী বেলা হইলে পঙ্কজিনী ও খোকার আসিতে

কষ্ট হইবে। কিন্তু 'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়'। কাপড়-চোপড় পরিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিতেই দেখিলেন, সম্মুখে অবিনাশ। হৌক অবিনাশ। তিনি আর দেরী করিতে পারেন না। অবিনাশ কহিল—চলুন দাদা, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।

অবিনাশকে লইয়াই যদু বাবু সেবাশ্রমে আসিলেন।

সেই সময় ডাক্তার ব্যানার্জী ডিউটীতে ছিলেন। প্রথম দিনে তাঁহার সহিত একটু আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। ডাক্তার ব্যানার্জী কহিলেন, কেমন, ভাল আছেন ত?

মৃদু হাসিয়া যদুবাবু উত্তর দিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজকে আমার ওয়াইফকে নিয়ে যেতে এলুম। আজ সাত দিন।

দরকার হ'লে আজকাল তিন-চার দিনেও লেবার পেসেন্টদের আমরা বাড়ী যেতে দি, কেন না, আজকাল ডেলিভারী কেশ এত বেড়েছে যে, আর আমরা জায়গা দিতে পারছি না!

ওঃ, তাই না কি! অনুগ্রহ ক'রে আমার ওয়াইফকে—"

বসুন, আমি ব'লে দিচ্ছি।

ঠুং ঠং—ক্রন্। ডাক্তার ব্যানারজীর কলিংবেলের শব্দে এক জন চাপরাসী আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি কহিলেন—মিস বসাক এখন আছেন ত?

নেহি বাবু, উনি ত আভি অফ্-ডিউটীমে হোয়েগা, নয়া বড়দিদিমণি—

মিসেস্ সেনগুপ্তা আছেন। ও! আচ্ছা, ওঁকে একবার আসতে বল ত?

মিসেস্ সেনগুপ্তা আসিলেন।

এঁর স্ত্রীকে নিতে এসেছেন, পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করুন। যান যাদু বাবু, ওঁর সঙ্গে যান।

অঙ্গন পার হইয়া মিসেস্ সেনগুপ্তার অফিস-ঘরে যাইবার পথটুকুর মধ্যেই বুড়া চাপরাসী আসিয়া যদু বাবুকে পাকড়াও করিয়া কহিল—মোহারাজ, হামলোকন কা বকসিস্ মিলনে চাই।

ও-পাশ দিয়া উড়িয়া চাকর বেহারী সম্মুখে হাজির হইয়া কহিল—মতে পানো খাইবারে তঙ্কা দিয় বাবু!

একটা কালো মোটা ঝি আসিয়া কহিল—বাবু আমাদের কথা ভুলে যাবেন না।

দারোয়ানদের এক জন পাশ দিয়া বলিতে বলিতে গেল—হামলোককা কুচ্ মিলতা হ্যায় বাবুসাব।

অবিনাশ যদু বাবুর কানে কানে কহিল—দাদা, ব্যাপার গুরুতর। বকসিসের ঠেলায় অস্থির হ'তে হবে। আপনি স'রে পড়ুন, বাড়ী যান; আমি পঙ্কজকে নিয়ে যাচ্ছি।

মিসেস্ সেনগুপ্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কত নম্বর বেড্?

যদুবাবু কহিলেন— থারটি নাইন।

অবিনাশ চুপি চুপি কহিল—দাদা, আপনি 'প-য়ে আকার' দিন তা হ'লে। আর দেরী করবেন না।

যদুবাবু তেমনি চুপি চুপি কহিলেন,—তাই কর তা হ'লে। ট্যাক্সিখানা থাক, এটুকু আমি আস্তে আস্তে হেঁটেই যাই। মিসেস্ সেনগুপ্তার উদ্দেশে কহিলেন—আমার একটু বিশেষ কাজ আছে, ইনি রইলেন এঁদের নিয়ে যাবার জন্যে আমি চললুম।

আচ্ছা যান। সিগ্নেচার একটা দরকার হবে। উনিই ক'রে দেবেন এখন।

যদু বাবু চলিয়া গেলেন।

মিনিট পনেরর মধ্যেই মিসেস্ সেনগুপ্তা অবিনাশকে বেড নং ৩৯ এর বার্থ-কার্ডখানি দিয়া দিলেন এবং অবিনাশ খাতায় একটা নাম সহি দিয়া নবজাত শিশু ও প্রসূতিকে লইয়া ট্যাক্সিতে উঠিল।

যেহেতু যদু বাবু একটু স্থূলদেহ, সেইহেতু থপ্ থপ্ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার বাটির পথটুকু আসিতে যতটা সময় লাগিল, অবিনাশের ট্যাক্সি তাহার পূর্ব্বেই আসিয়া পৌছিল। মিনিট ১০ পরেই যদুবাবু বাটী আসিয়া উপরে তাঁহার কচি ছেলের কান্নার শব্দ শুনিয়া অধীর আনন্দে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।—খোকন—খোকন।—ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ, এইবার বাড়ী আমার সারা দিন রাত মাতিয়ে রাখবে আর কি!

ব্যস্ত হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যদুবাবু মেজেয় শোয়া খোকনের দিকে চাহিয়াই যেন হঠাৎ বিষম ধাক্কা খাইলেন। এ কি! এ কাদের বদ-খত্ বিশ্রী একটা খোকা! পঙ্কজ—পঙ্কজ!

পঙ্কজ রুখিয়া ঘরের এক কোণ হইতে তর্জ্জন করিয়া উঠিল—ক্যায়সা কাম আপলোকোন্ কা? হামারা ছিপায়কে হামকো কৌও হিঁয়া লে আয়া?

কি সর্ব্বনাশ! এ যে হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ!

অবিনাশ—অবিনাশ!

অবিনাশ নীচের বৈঠকখানাতেই বসিয়াছিল। উপরে আসিলে যদুবাবু কহিলেন—এ কি কাজ করেছ,—কাকে নিয়ে এসেছ?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া দেখিয়া কহিল—আমি তার কি জানি. বলুন। বেড নং ৩৯ ত ?

হাঁ।

তাই ত আনা হয়েছে। বার্থকার্ড দেখুন না।

যত বাবুর মাথায় যেন শরতের গোটা সুনীল আকাশখানা কালো হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

৫

এদিকে যদুবাবুর গৃহে, ওদিকে সেবাশ্রমে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বেড্ নম্বর ৩৯-এ শ্রীমতী পঙ্কজিনী মিত্র ছিল বটে, কিন্তু কামাখ্যাচরণ বসু নামে তাহার ভাই আসিয়া ৪র্থ দিনে তাহাকে লইয়া যায়। তাহার পরিত্যক্ত 'বেড'এ সঙ্গে সঙ্গেই জানকী নামে এক হিন্দুস্থানী মহিলাকে স্থান দেওয়া হয়। স্থানাভাবে ইতিপূর্ব্বে তাহাকে কয়দিন যাবৎ মেঝেতেই বিছানা করিয়া রাখা হইয়াছিল। তার পর যদু বাবু আজ বেড্ নং ৩৯ এর উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লইতে আসিলেন। উক্ত জান্‌কী দেবী-কেই অবিনাশের সহিত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ভুল হয়ত সকলেরই হইয়াছিল, কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভুল ত আর কাহারও নয়। এমন কি শ্রীমতী জান্‌কী যখন ট্যাক্সিতে উঠিয়া তাহার স্বামী 'রামখেলান' মিশিরের বদলে একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত অবিনাশকে দেখে, তখন সে মনে করিয়াছিল, যেমন ও ঘরের মেঝের বিছানা হইতে তিন দিন পরে এ ঘরে খাটের উপর তাহাকে আনা হইয়াছিল, তেমনি এ হাসপাতাল হইতে

আবার হয় ত অন্য কোন হাসপাতালে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। যদুবাবুর শয়ন ঘরে আসিবার পর তবে সে তাহার ভুল বুঝিতে পারে।

যাহা হউক, সকলের অপেক্ষা অবস্থা সঙ্গীন যদু বাবুর। তাঁহার প্রাণের পঙ্কজকে কোথাকার কে কামাখ্যা আসিয়া এই রকমে লইয়া গেল! আর কি তাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে? সেবাশ্রমের নামে নালিশ? কিন্তু তাহাতে কি পঙ্কজকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে? ফল হয়ত কিছুই হইবে না, অধিকন্তু চারিদিকে ঢি-ঢি পড়িয়া যাইবে। হায় পঙ্কজ! হায় পঙ্কজ! এ তুমি কি করিলে!

যদুবাবুর এই দুঃখের সময়ে শ্রীমতী জানকীর স্বামী রামখেলান মিশির আসিয়া চোখ মুখ রাঙাইয়া হুমকি দিল—এ ক্যায়সা কাম্ আপকো! হামরা জরু তোম্ ইস্‌মাফিক করকে—

এই নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও রামখেলান মিশরের উগ্র-মূর্ত্তি দেখিয়া যদুবাবুর মাথা গরম হইয়া উঠিল। তিনিও দৃপ্ত কণ্ঠে কহিলেন—হামারা জরু নেই মিল্‌নেসে. হাম উসকো নেই ছোড়েঙ্গে।

নেহি ছোড়েঙ্গে? তর্জ্জনে বাড়ী ও বৈঠকখানা

কাঁপিয়া উঠিল। এদিকে স্বামীর গলার আওয়াজে দ্বিতলের উপর হইতে শ্রীমতী জানকী কান্না সুরু করিল। তাহার শিশু বাপের তর্জ্জন এবং মায়ের কান্নার ধুয়া ধরিয়া মিহি গলায় চীৎকার জুড়িয়া দিল। ব্যাপার দেখিয়া অবিনাশ কহিল—দাদা ছেড়ে দিন। এদের আটকে হবে কি?

রামখেলান মিশির শ্রীমতী জানকীকে লইয়া সদরে চলিয়া গেল। এদিকে যদু বাবু 'হা পঙ্কজ—হা পঙ্কজ' বলিয়া পথে বাহির হইলেন। কামাখ্যাচরণ বসু! এই নামের যত লোক যেখানে ছিল, সব খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নান আহার বন্ধ হইয়া গেল। কালীঘাট, ভবানীপুর, চেৎলা, বালীগঞ্জ, টালীগঞ্জ—দক্ষিণ কলিকাতার কোন স্থান আর তিনি খুঁজিতে বাকী রাখিলেন না। দক্ষিণ শেষ করিয়া উত্তরে আরম্ভ করিলেন, সমস্ত জীবনভোর তিনি পঙ্কজকে খুঁজিলেন। তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতেই তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। পঙ্কজিনী! পঙ্কজ! খোকামণি!

পাশের এক পথিক সমবেদনার স্বরে কহিলেন, মশাই, কি হয়েছে, বলুন ত?

যাহা হইয়াছিল, যদু বাবু সংক্ষেপে এর সংবাদে

তাহা বর্ণনা করিলে, ভদ্রলোকটি বলিলেন—উঃ, বাঁচলুম! নইলে আপনার বাড়ী খুঁজতে হয় ত আমাকেও কত ঘুরতে হ'ত। আমি ত আপনার বাড়ীই যাচ্ছিলাম আপনার বাড়ীর ঠিকানা ত হচ্ছে—

৭১।১ রসা রোড সাউথ।

তাই ত বলচি। তা'হলে ঠিকই হয়েচে। যাক, বাঁচা গেল। স্ত্রী আপনার ভাল আছে যদুবাবু কামাখ্যা ব'লে ঐ বেটা বদমাস্ তাকে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় একটা মেয়ে মানুষের হেফাজতে রেখে দিয়েছে। কোন ঠিকানায়, কোথায় আছে, এখন আপনাকে তার সে সব কিছু বলবো না। কামাখ্যা বেটা এখন নেই, দু'দিন পরে আসবে। যার জিম্মায় সে রেখে চ'লে গেছে, সেই মেয়ে মানুষটা বলেচে—

অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া যদুবাবু ক'হিলেন—চলুন মশাই, দয়া ক'রে সেখানে একটিবার নিয়ে চলুন। আমার ছেলেটি কেমন আছে?

খুব ভাল আছে। তার পর শুনুন না। আপনি এখন গেলে গোলমাল হবে! হয় ত তাতে কোন কাজ হ'বে না! আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার স্ত্রী আর ছেলেকে আপনার ওখানে নিয়ে আসচি।

দিন মশাই, চির জীবন আপনার কেনা হয়ে থাকব।

কোন চিন্তা নেই! শুনুন তার পর।—সেই মেয়ে-মানুষটা বলেচে যে, তাকে গোটা তিরিশ টাকা দিলে, সে আপনার স্ত্রীকে চ'লে আসতে দেবে! তাই আপনার স্ত্রী আপনাকে তিরিশ টাকা আমাকে দিয়ে এখনি পাঠিয়ে দেবার জন্য একখানা চিঠি লিখে দিয়েছেন। মা লক্ষ্মী বলেচেন, এই নিয়ে আর যেন লোক জানাজানি না হয়। কামাখ্যা এসে পড়লে বিপদ হবে। সামান্য তিরিশটা টাকা আমায় দিয়ে দিন। যদুবাবু কহিলেন—রাম-রাম, এ নিয়ে কি আমি পুলিশ-ফরেদ বা লোক জানাজানি করতে চাই! দেখি চিঠিখানা একবার।

কিন্তু ভদ্রলোকটি পঙ্কজের চিঠিখানা হারাইয়াছেন। এ পকেট, ও পকেট, সে পকেট, ট্যাঁক, সর্ব্বত্র হাতড়াইয়াও চিঠি পাইলেন না। ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—চিঠিখানা মা-লক্ষ্মীর তাহলে কোথায় পড়ে গিয়েছে, খুব জোরে জোরে আসচি কি না। এতবড় একটা পরোপকার! আচ্ছা, আপনি বাড়ী যান। আমি গিয়ে আর একখানা চিঠি লিখিয়ে—

থাক। আবার গিয়ে চিঠি আনতে হবে না। পঙ্কজ আর খোকা বেশ ভাল আছে ত?

ভাল আছে, তবে আপনার খোকা এরি মধ্যে ভারি দুষ্টুমী আরম্ভ করেচে! কোলে বেশ আছে, আর শুইয়ে দিলেই—ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ।

দেখুন, আমার জন্যে আপনাকে আজ বড্ড কষ্ট করতে হোল: দয়া ক'রে আমার সঙ্গে আসুন। আপনাকে আমি ত্রিশটে টাকা দিয়ে দি, বাড়ীটাও আপনার দেখা হবে এখন। কত দূর সে? ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওদের নিয়ে আসতে পারবেন না?

অতও লাগবে না। আগে মা লক্ষ্মীদের এনে ফেলি, তার পর আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে ওদের ঐ বাড়ীটাও দেখিয়ে দোবো, আর কামাখ্যা বেটাকে তখন দেখে নেওয়া যাবে।

আগে আগে যদুবাবু, পিছন পিছন ভদ্রলোকটি অগ্রসর হইল।

এক ঘণ্টা—দুই ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা—

পথিক ভদ্রলোকটি পরোপকারসূত্রে টাকা ত্রিশটি লইয়া যাওয়ার পর তিনটি ঘণ্টা কাটিয়া গেল। যদুবাবু ছট্ ফট্ করিতেছেন, একবার উঠিতেছেন একবার বসিতেছেন, একবার শুইয়া পড়িতেছেন। মধ্যে মধ্যে পথে বাহির হইয়া দেখিয়া আসিতেছেন। পথে কত

লোক আসিতেছে, যাইতেছে ; কিন্তু যদু বাবুর তাহাতে আসিয়া যায় কি ! তাহার পঙ্কজ ও খোকার আসাই যে আজ সবচেয়ে বড় আসা। কিন্তু হায় তাহারা কোথায় ? ঐ আসিতেছে। কিন্তু পঙ্কজ ও খোকা নয় ! আসিতেছে অবিনাশ ! অবিনাশ বাহিরে কোথাও, বোধ হয় পঙ্কজের খোঁজেই --বাহির হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত শুনিয়া কহিল—আপনি এমন বুদ্ধিশূন্য হোয়ে পড়েছেন দাদা, যে পথের একটা জোচ্চোর ফাঁকিবাজী ক'রে, তিরেশটে টাকা আপনার গালে চড় মেরে নিয়ে গেল ! এখনো আপনি তার অপেক্ষায় 'ঘর-বার' কচ্ছেন।

যদুবাবু 'ন যযৌ-ন তস্থৌ' নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটা বুকফাটা কান্না তাহার বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিল। মড়ার উপর খাড়ার ঘা ! পূজার সেদিন প্রথম দিন। সকলেরই মনে আনন্দ, উৎসাহ, উল্লাস, শুধু সুখ নাই, আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই—যদু বাবুর। আজিকার এ' আনন্দের ধরণী যেন তাহার নয় ! জগজ্জননী আনন্দময়ীর আগমন যেন আর সকলেরই কাছে সার্থক শুধু তাহার কাছে নয়। তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অবিনাশ কহিল—

দাদা, এরকমে কিছু হবে না। অত অধীর হোলে কি চলে? গোটা পঞ্চাশ টাকা আপনি আমায় দিন দেখি। একবার রামশশীকে সঙ্গে ক'রে থানায় গিয়ে দেখি, কি করতে পারি।

যদুবাবু প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিলেন—ভাখ, ভাই ভাখ, একটু চেষ্টা-চরিত্তির কর্। এ সময় তোরাও নিষ্ঠুর হস্ নি। কোঁচার খুঁটে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে তিনি ঘরের মধ্যে গেলেন ও আলমারি খুলিয়া দশ টাকার পাঁচখানা নোট আনিয়া অবিনাশের হাতে দিলেন।

অবিনাশ নোট কয়খানি পকেটে রাখিতে রাখিতে কহিল—আপনি কিছু ভাববেন না, দাদা। পঙ্কজকে যেমন ক'রে পারি, আমি উদ্ধার ক'রে আনবো!

অবিনাশ চলিয়া যাইতেছিল; যদুবাবু ডাকিয়া কহিলেন—আর ঐ বেটা কামাখ্যাকে যদি কোন রকমে ধরে আনতে পারিস, তা হ'লে আরও পঞ্চাশ টাকা তোকে বকসিস করবো ভাই।

অবিনাশ চলিয়া গেল।

* * *

অষ্টমী পূজা।

যদুবাবুর দ্বিতলের বারান্দা হইতে বাঁড়ুয্যেদের পূজার আসর দেখা যায়। লোকজনের ভিড়, তুমুল কোলাহল, অবিরাম ঢোল-কাঁশির আওয়াজ। ধূপধুনার সুগন্ধি ধূম-রাশি—আসরের সামিয়ানা ভেদ করিয়া আকাশে উঠিতেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল নূতন জামা কাপড় পরিয়া দলে দলে আসিতেছে যাইতেছে। পূজার আসর আজ হাস্যে, কোলাহলে, বাদ্যে, গীতে, গন্ধে ভরপুর। যদু বাবু বারান্দার চৌকিখানিতে বসিয়া এই সবই দেখিতেছিলেন। কিন্তু তাই কি? চোখ তাঁহার এই সবের দিকেই ছিল বটে, মন যে কোথায়, তাহা মনের কর্ত্তাই বলিতে পারেন।

—পঙ্কজ—পঙ্কজ—পঙ্কজ!

কি গো, অমন করছ কেন? বুড়ো বয়সে ক্ষেপলে নাকি?

যদুবাবু লাফাইয়া উঠিলেন। দেখিলেন—আনন্দময়ীর আগমনের দিনে পঙ্কজিনী জীবন্ত আনন্দকে কোলে লইয়া সিঁড়ি আলো করিয়া উপরে উঠিতেছে।—এ কি! পঙ্কজ! এলে তুমি! খোকন্—খোকন্ সোনা? যদু-বাবুর সারা অঙ্গে উল্লাসের তরঙ্গ খেলিয়া গেল।

পিছন হইতে অবিনাশ কহিল—দাদা, কামাখ্যাকেও ধ'রে এনেচি। বখসিসের পঞ্চাশ টাকা দিন।

এনেছিস—এনেছিস! কই—কই?

বখসিসের পঞ্চাশটা টাকা আগে দাও।

আনন্দাতিশয্যে যাদুবাবু পঞ্চাশ টাকার নোট তদ্দণ্ডে বাহির করিয়া আনিয়া অবিনাশের হাতে দিয়া কহিলেন—হয়ে..নিয়ে আয় ত, কামাখ্যাকে একবার দেখি।

অবিনাশ নোট কয়খানি ভাল করিয়া পকেট-জাত করিয়া, জোড়হাতে মাথা নত করিয়া কহিল—কিছু মনে করবেন না দাদা! এই আমি অবিনাশই হলুম গিয়ে—কামাখ্যা। জোর ক'রে বলেছিলুম যে, পাঁচ দশে পঞ্চাশ টাকা আপনার কাছ থেকে আদায় করবো! তা ত করলুমই, তার উপর আরও পঞ্চাশ ফাউ। এক্সকিউজ মি দাদা।

ঘরের ভিতর পঙ্কজের কোলে খোকা কাঁদিয়া উঠিল—ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ।

পুলকে উৎফুল্ল হইয়া যদুবাবু কহিলেন—অ্যাঁ! কামাখ্যা তা'লে তুই। তোর এই কাণ্ড শা—

আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া, তেমনি বিনয়-নম্রভাবে হাতজোড় করিয়া অবিনাশ দাঁড়াইয়া রহিল।

শশী সরকারের শুভ-বিবাহ।

১

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে শশী সরকার তাহার চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া এক হাতে শটকার নল ধরিয়া তামাক খাইতে-ছিল আর এক হাত মস্তকের প্রকাণ্ড টাকটির উপর ধীরে ধীরে বুলাইতেছিল।

টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ইহাই ভাবিতেছিল যে, তাহার অবর্ত্তমানে ছোঁড়াটা—অর্থাৎ শ্যালিকাপুত্র হাবু—বিষয়-আশয় কিছুই রক্ষা করিতে পারিবে না, যেহেতু, প্রায় ঘণ্টা তুইয়েকের উপর কাছারী-বাগানের আমকয়টা পাড়াইয়া আনিতে গিয়া এখনও পর্য্যন্ত বাড়ী ফিরিল না। বাড়ী হয় ত এক সময়ে সে ফিরিবে, কিন্তু ছোঁড়ার যে রকম বুদ্ধি-শুদ্ধি, হয় ত শূন্যহাতে ফিরিবে,

আমগুলা আর ঘরে আসিয়া পৌছিবে না, পথেই সব বিতরণ হইয়া যাইবে।

কলিকার আগুন টানে টানে যেমন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, হাবুর কথা ভাবিতে গিয়া তাহার প্রতি তাহার অন্তরও তেমনই অল্প অল্প জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ তামাকের টানে ও হাবুর চিন্তায় বাধা জন্মাইয়া দিয়া যে লোকটি দরজা ঠেলিয়া সম্মুখের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার দিকে চাহিয়া শশী সরকার বলিয়া উঠিল,—কি হে, বলাইচন্দর যে! বাড়ী এলে কবে?

—এসেছি ত আজ তিন চার দিন হয়ে গেল, খোঁজ খবর ত আর নেন না. বাড়ী থেকেও বা'র হ'ন না,—তবু যদি দাদার আমার ঘরে বৌদি থাকতো—

—আরে ভায়া, বৌদি তোমার নেই বলেই ত হাত-পা-ভাঙ্গা হয়ে প'ড়ে রয়েছি। ঘরে তোমার বৌদি থাকলে কি আর এই রকম—জবু-থবু হয়ে থাকতুম! তা হ'লে তোমাদের মতই—চরকী ঘুরতুম, ভায়া, চরকী ঘুরতুম।

সত্যি, দাদা বাড়ী থেকে বুঝি আর বার-টার হন না?

বেরুব কি,—আর পারি না। একটু ঘোরাঘুরি করলেই হাঁপ ধ'রে আসে। নানান্ রোগে ধরেছে শরীরকে চেপে! আর তা ছাড়া, কি জান ভায়া, ঘরে মেয়েছেলে কেউ থাকলে শরীরের তবু একটু তোয়াজ হয়, আমার হ'ল একেবারে নিরিমিষ সংসার!

আচ্ছা দাদা, সেবার এসে শুনে গেলুম, বিয়ের জন্যে চেষ্টা-চরিত্তির কচ্ছেন, তা তা'র কি হ'ল দাদা?"

ওরে ভাই, ছেড়ে দাও ও সব কথা। এ গাঁয়ের মত দুষ্টু গাঁ কি আর আছে! নেহাৎ বাপ-ঠাকুদ্দার আমলের বাস, তাই এ গাঁয়ে প'ড়ে থাকা, নইলে ঝাঁটা মেরে কবে এ গাঁ ছেড়ে চ'লে যেতুম। নীলমণি বাঁড়ুয্যে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে ক'রে আনলে, তা'র মাথার বেঠিক হ'ল না; কেন না, সে হ'ল আধখানা গাঁয়ের মালিক, আর আমরা হলুম গরীব, তাই কথায় কথায় আমাদের মাথার দোষ হয়ে যায়, আমরা হই পাগল।

আচ্ছা দাদা, আপনারও ত চল্লিশের ওপর হয়েছে?

শটকার নলটাকে ঠেলিয়া রাখিয়া, উত্তেজিত স্বরে শশী সরকার বলিয়া উঠিল,—"আরে, তাতে কি? আসুক দেখি নীলু বাঁড়ুয্যে একবার আমার সঙ্গে

গায়ের জোরে ? ঐ অত বড় হাতীর মত শরীর যদি আমি তুলে আছাড় দিতে না পারি ত আমার নামই—। সে দিন, আমার খিড়কীর অত বড় জামগাছটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চেলিয়ে কাঠ ক'রে—উঃ—হু-হু! বলাই ! বলাই !"

হঠাৎ দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া শশী সরকার সেইখানেই কাত হইয়া ঢলিয়া পড়িল। বলাই ব্যস্ত হইয়া একেবারে তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল,—কি হ'ল দাদা ?

মিনিটখানেক চোখ বুজিয়া নীরবে তেমনই ভাবে পড়িয়া থাকিবার পর একটু সুস্থ হইয়া শশী সরকার উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"জোরে কথা কইতে গিয়ে হঠাৎ বুকের ভেতর একটা ব্যথা—ব'স ভাই, একটু দম নি। অনেক কথা আছে, যেওনা।

শশী সরকার—একটু সুস্থ হইলে বলাই তাহার সঙ্গে আরও দুই একটা কথা কহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে, শশী জিজ্ঞাসা করিল,—"হাতে ও কি বই, ভায়া ? যুদ্ধের খবর-টপর কিছু আছে না কি ?"

বলাই কহিল—"না দাদা, যুদ্ধের খবর-টপর এতে নেই, এটা একটা মাসিকপত্র—গল্প আছে, পড়বেন ?"

আরে, একটু বোসোই না ভায়া! কি গল্প, একটা তুমিই পড়, শোনা যাক।

বলাই আবার বসিল এবং তাহার হাতের পত্রিকাখানি খুলিয়া একটি গল্প পড়িবার উপক্রম করিলে শশী কহিল,—একটু দাঁড়াও ভায়া, কল্‌কেটাতে একটু আগুন দিয়ে আনি!

তাহার পর বলাই গল্প পড়িতে লাগিল, আর শশী সরকার শট্‌কা টানিতে টানিতে সেই গল্প শুনিতে লাগিল।

এক স্থানে শশী কহিল,—এইখানটা আর একবার পড় ত, ভাল ক'রে শুনি নি।

বলাই পড়িতে লাগিল—সপ্তদশবর্ষীয়া মন্দাকিনী স্বামী-গৃহে আসিয়া তাহার বৃদ্ধ স্বামীর জর্জ্জরিত অন্তরের উপর যেন শান্তির চন্দন-প্রলেপ মাখাইয়া দিল। মন্দার সাহচর্য্যে গঙ্গাচরণ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল। তাহার বাহান্ন বৎসরের দেহ ও মনের উপর দিয়া যৌবন-তরঙ্গ যেন উল্লাসে নাচিয়া উঠিল।

মন্দা খায় দায়, হাসে খেলে, বেড়ায়; হার্ম্মোনিয়ম লইয়া দক্ষিণের জানালা খুলিয়া গান গায় আর গঙ্গাচরণ চব্বিশ ঘণ্টাই তাহার কাছে কাছে ফেরে। কখন বা

গঙ্গাচরণের হাত ধরিয়া মন্দা কহে,—'ওগো অমুকচরণ মশাই, ওই চরণে স্থান দেবে ?' গঙ্গাচরণ অমনি মন্দাকে তাহার বুকের হাড়ের মধ্যে টানিয়া কহে—'তোমার স্থান এইখানে মন্দা !'

তামাক শুধু শুধুই পুড়িয়া যাইতেছিল। গল্পটি শেষ হইলে, শশী সরকার আবার শট্‌কাটি হাতে করিয়া একাগ্রমনে টানিতে লাগিল। তাহার পর মুখ তুলিয়া যখন চাহিল, তখন বলাই সদর-দরজা খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শশী সরকার তাড়াতাড়ি রাস্তায় আসিয়া বলাইকে ডাকিয়া ফিরাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—এ বই কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, ভায়া ? বড় চমৎকার গল্প। আমাকে একখানা আনিয়ে দিতে হবে কিন্তু। যা দাম হয়, এখন না হয় নিয়ে রাখ।

২

সাঁওতালপাড়ায় সুদের তাগাদা করিয়া বেলা প্রায় প্রহরেকের সময় শশী সরকার গৃহে ফিরিয়া নিজের মনে বকিতে লাগিল,—বেরুবার সময়ই বুঝেছিলুম যে, আজ আর হাত চিৎ করতে হবে না! কোন হারামজাদার কাছ থেকে আজ আর একটা পয়সা আদায় করতে পাল্লুম না। সুরু বষ্টুমের মকদ্দমার দিন আজ, তা চুঁচড়োয় যে যাবো, তা' ট্রেণ-ভাড়াটি গাঁট থেকে বা'র ক'রে তবে আজ যেতে হবে। বেটাদের অসময় হ'লে ছুটে আসবে,—সরকার মশাই—সরকার মশাই ক'রে, আর আমার দরকারের সময় গেলেই সব ব্যাটা ঢোক গিলতে সুরু করবে,—কারও অসুখ, কারও জেনানা পালিয়েছে, কারও গরু গেছে থানায়।

গদাইয়ের মা শশী সরকারের বাড়ী রাঁধিত। সে রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া কহিল,—আদায়-পত্তর কিছু হ'ল না বুঝি, ঠাকুরপো?

ছাই হ'ল। ১২টার ট্রেণে চুঁচড়ো যেতে হবে, সকাল সকাল দুটি চাপিয়ে দিও বউ। স্নানটাও সকাল সকাল ক'রে ফেলি। সমস্ত রাত কাল আর চোখে-পাতায় করতে পারি নি!

কেন ঠাকুরপো, শরীরটা কি ভাল নেই?

বউ, লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে যায় যে,—আদয়-পত্তরও তার হয় না, শরীরও তার ভাল থাকে না! অপরাধের মধ্যে রাত্রে শুয়ে শুয়ে বলাইয়ের বইয়ের সেই গল্পটা পড়তে একটু রাত হয়ে গেছলো। তার পর আর সমস্ত রাত ঘুম এলোই না! মাঝে মাঝে একটু-আধটু তন্দ্রার মত যদি বা এল, ত খালি স্বপ্নেতেই তা ভরা। সারাটা রাত ধ'রে খালি স্বপ্নই দেখছি। এ বিড়ম্বনা ভগবানের আমাকে দেওয়া কেন?

কোন কুস্বপ্ন কি ঠাকুরপো?

ইহার কোন উত্তর না দিয়া—শশী সরকার বরাবর দালানে উঠিয়া গেল এবং পাইচারি করিতে করিতে কহিল,—আমার পক্ষে কু ছাড়া আর কি বলবো!—আ মলো, ঐ কালো বেড়ালটা আবার কাদের এসে জুটলো?

গদাইয়ের মা কহিল,—ও যে আমাদেরই 'সুন্দরী',

ঠাকুরপো ! হাবু একটা শিশি থেকে কালি মাখিয়ে মাখিয়ে ঐ রকম কালো ক'রে দিলে !

অ্যাঁ ! বলিয়া শশী সরকার তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে ! এক শিশি কলপ একেবারে নষ্ট করেছে !

সাম্‌নে ত তোমার চুল নেই, ঠাকুরপো, পেছনের পাকা চুলে লাগাবার জন্যে কলপ আনিয়েছিলে বুঝি ? তা,—আহা—হা ! হেবোটা কি গো ? ব'সে ব'সে বেড়ালটাকে কলপ মাখাচ্ছিল ? আমি ভাবলুম, দোয়াতের কালি শিশিতে ঢেলে নিয়ে বুঝি মাখাচ্ছে ! আচ্ছা ঠাকুরপো, পেছনের চুলগুলোয় মাখালে সুন্দরীর মত ঐ রকম কালো হয়ে যাবে ?

ক্রুদ্ধ হইয়া শশী সরকার কহিল,—হেবোরও যেমন বুদ্ধি, তোমারও বউ,তেমনি বুদ্ধি-বিবেচনা, চুল কালো হয় বটে, কিন্তু আমি চুল কালো করবার জন্যে কলপ আনিয়ে রেখেছি ?—উর্দ্ধুগ উঠে ম'রে যাই রোজ,—আর ঐ উর্দ্ধুগের জন্যেই ত সামনেকার চুলগুলো সব উঠে গেল। ভাবলুম, হপ্তায় হপ্তায় কলপটা লাগালে উর্দ্ধুগ ওঠার হাত থেকে বাঁচবো—আমার কি আর সখের জন্যে—

ছোঁড়া গেল কোথায় ? সর্ব্বক্রমে আমায় জ্বালাতন ক'রে মারলে ! একে আমার এই জ্বালাতনের দেহ— নাঃ. ওকে বাড়ী থেকে বিদেয় না করলে আর আমার কিছুতেই ভাল নেই, বলিয়া কলপের শিশিটি হাতে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

সুরো বষ্টুমের আজ মোকর্দ্দমার দিন। আহারাদির পর বাটী হইতে বাহির হইবার সময় শশী সরকার ভাঁড়ারের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ফিস্ ফিস্ করিয়া গদাইয়ের মাকে কহিল;—"আজ তা হ'লে গেনীর মাকে একবার— বুঝেছ ত ? বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে —যেমন ব'লে দিয়েছি। বলবে ওর নামেই না হয় সব লিখে প'ড়ে দোবো, বুঝলে ? ফিরে এসে যেন খবরটা জানতে পারি।"

তাহার পর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, হাতের সাদা ক্যাম্বিসের ব্যাগটি মাটীতে রাখিল এবং উর্দ্ধমুখে যোড় হাত মাথায় ঠেকাইয়া স্বর্গের দেব-দেবীর কাছে বহুক্ষণ ধরিয়া মনোবাঞ্ছা জানাইবার পর ধীরে ধীরে ষ্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

সন্ধ্যা হইয়া যাইবার অনেক পরে শশী সরকার চুঁচুড়া হইতে বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই রান্নাঘরের

দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং গদাইয়ের মা'র দিকে চাহিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিতেই গদাইয়ের মা ডালের হাতা মালসার উপর রাখিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কহিল,—"নাঃ, সে হবে না, ঠাকুর পো! ওরে বাবা, গেনীর মা একেবারে ফোঁস্ ক'রে এলো! বলে —মেয়েকে আমার শ্মশানের পোড়া কাঠের সঙ্গে বে দিতে হয়—সে-ও ভাল। সে কত কথাই যে ফট ফট ক'রে শুনিয়ে দিলে!"

মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চাপা গলায় শশী সরকার কহিল, —"ভাল—ভাল—ভাল। ফোঁস্ ফোঁসানির দফা খেয়ে এসেছি! মত এবার না ক'রে আর উপায় নেই! একটি কাজ খালি, বউ তোমাকে করতে হবে। এটা হোলে, আমারও যেমন ভাল, তোমারও আমি তেমনই ভাল করবো বউ, এ তুমি ঠিক জেনো! খালি, আর একটা কাজ—"

"কি করতে হবে, ঠাকুরপো?"

পিরাণের বুক-পকেট হইতে কাগজে মোড়া একটি জবাফুলের ছোট্ট কুঁড়ি বাহির করিয়া গদাইয়ের মাকে দেখাইয়া সরকার কহিল,—"আর কিছু নয়,—সোঁ-কাপড়, সোঁ-চুলে এইটি গেনীর মা'র মাথা ডিঙ্গিয়ে

ফেলে দিতে হবে। ব্যস্! দেখি মেয়ের হাত ধ'রে বয়ে এনে হাতে গচিয়ে দিয়ে যেতে হয় কি না!—হাঁ ক'রে দেখছো কি, বউ? শশী সরকার বাজে যোগাড়ে ঘোরে না! খাস কামরূপের জিনিষ! সবে মাসখানেক হ'ল তিনি সেখান থেকে বিদ্যে শিখে—"বলিতে বলিতে সরকারের বিষম এক কাসি আসিল এবং কাসিতে কাসিতে চোখের তারা ঠিক্‌রাইয়া, চক্ষু তাহার কপালে উঠিল, মুখখানা নীলবর্ণ হইয়া গেল এবং দুহাতে বুক চাপিয়া সেদিনের মত সটান সেই ধূলার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের ভাঙ্গা পাখাখানা লইয়া গদাইয়ের মা জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

৩

চুঁচুড়ার আদালত হইতে যে রাস্তাটা নয়া-বাজারের ভিতর দিয়া বরাবর গঙ্গার তীরে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই রাস্তারই উপর বাজারের কাছে একখানি টীনের দোতালা হইতে কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া শশী সরকার নীচে নামিতেছে। ছোট্ট বাড়ীখানির টানা কাঠের বারান্দা জুড়িয়া প্রকাণ্ড এক সাইনবোর্ড ঝুলিতেছিল—কামাখ্যা-প্রত্যাগত যাদুকর জ্যোতিষী যুগলানন্দ স্বামী।

সে ভগ্ন, দোদুল্যমান কাঠের সিঁড়ির তখনও দু' একটা ধাপ নামিতে বাকী আছে, উপরের বারাণ্ডা হইতে গলা বাড়াইয়া বোধ হয় যুগল বাবাই ডাকিলেন সরকায় মশাই, আর একটা কথা শুনে যাবেন।

কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেই দ্বিতীয় লছমণঝোলা, দ্বিতীয়বার পারাপার হইতে হইবে ভাবিয়া ক্লান্ত শশী সরকার সেই সিঁড়িরই উপর বসিয়া পড়িয়া একটা দম্ লইবার পর আবার সন্তর্পণে তাহা আরোহণ করিতে সুরু করিল।

যুগলানন্দ স্বামী তাঁহার গৈরিক চাদরে মুখটা

একবার মুছিয়া লইয়া কহিলেন,—"আপনি চিন্তাযুক্ত হবেন না। আপনার হস্ত-রেখায় যখন ধনুক চিহ্ন বর্ত্তমান, তখন তা থেকে বাণ নির্গত হয়ে কোথাও না কোথাও গিয়ে লাগবেই। তার ওপর রইল আমার ক্রিয়া। সুতরাং ভার্য্যালাভ আপনার পুনরায় যে হবেই তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। তবে, গ্রামের মেয়েটি যে হ'ল না কেন, সেইটেই আমি ধ্যানে চিন্তা ক'রে দেখে আবার আপনাকে ফেরালুম।

শশী সরকার কহিল,—"কি দেখলেন ধ্যানে ?

"দেখলুম, আপনার ধনুকের টানাটি যেমন বৃহৎ, ক্ষেপণ দূরগামী হবে; সুতরাং শরবিদ্ধ হয়ে যিনি আসবেন, তাঁর স্থান একটু দূরান্তরেই হবে, নিকটে হবে না। যাক, চিন্তার কিছুই নেই, তবে ঐ যা ব'লে দিলুম, ক্রিয়াটি করবার জন্যে বাকী ঐ সতেরটি টাকা শীগ্‌গীরই দিয়ে যাবেন, যাতে অমাবস্যার রাত্রেই আমি আপনার জন্যে বসতে পারি।"

সেই দিন সন্ধ্যার পর শশী সরকার যখন গৃহে ফিরিল, তখন তাহার চক্ষু লাল, নিশ্বাসে আগুনের হল্কা, জ্বরে দেহ পুড়িয়া যাইতেছিল, সুতরাং গৃহে ফিরিয়াই শশী শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

সাত দিনের মধ্যেই শশী সরকার আরোগ্যলাভ করিল। তবুও প্রত্যহ ডাক্তার আসিতে লাগিল। সে দিন সকালে ডাক্তার আসিয়া কহিল, পরশু গরম জলে স্নান করেছেন, আজ পুকুরের জলে বেশ ক'রে স্নান করুন গে! আর আমার আসবার দরকার নেই, সেরে গেলেন। তবে টনিকটা ছ'বেলা ছ'দাগ যেমন খাচ্ছেন—খেয়ে যাবেন।"

শশী সরকার জিজ্ঞাসা করিল,—"সকালেই যে সেজেগুজে বেরিয়েছ ডাক্তার, ভিন্ গাঁয়ে ডাকে যেতে হবে নাকি?

"হ্যাঁ, চাঁদপুরের নবীন রায় যে যায়-যায়! বুড়োর শরীরটা বেশ ছিল, কোত্থেকে এই বয়সে এক ধেড়ে মেয়ে বিয়ে ক'রে এনে নিজের মরণ নিজেই ডেকে নিয়ে এল! নইলে——"

হ্যাঁ হ্যাঁ, নবীন রায়ের অবস্থা শুনলুম খুবই খারাপ! তার অসুখটা কি ডাক্তার?"

বুড়ো বয়সে অনিয়ম অত্যাচারে যা হয়,—সমস্ত নার্ভস্ shattered—প্রায় Paralised! ঐ ফুলপুরের আশু বৈরিগীও ত মলো ওইতে। অত বিষয়-সম্পত্তি —একটা কোন ভাল কাজে দান ক'রে গেলেই হত।

তা নয়, পঞ্চাশ বছর বয়সে এক উপসর্গ জুটিয়ে চক্ষু মুদলে! সকল কাজেরই একটা সময় অসময় আছে ত? এই মনে করুন, সরকার মশাই, আপনিই যদি এই বয়সে একটা ——"

"আচ্ছা, কচি চাল্‌তার টক বা একটু আধটু আন্‌সার গুড় অম্বল খেতে পারা যাবে, ডাক্তার? কেন না, ওগুলু যখন খাচ্ছি, তখন তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে খাওয়াই——"

"খাবেন—খাবেন, তবে বেশী খাবেন না, অল্প একটু খাবেন" বলিয়া ডাক্তার তাহার ষ্টেথেস্‌কোপ্‌টি কোটের পকেটে পূরিয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে শশী সরকার তৈল মাখিয়া বেণে-পুকুরের ঘাটে গিয়া দেখিল, পাড়ার দুই-চারি জন স্নান করিতে করিতে বিশেষ উৎসাহের সহিত কাহারও সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। শশী সরকার জলে নামিয়া কহিল, —"কে উচ্ছন্ন গেল, গাঙ্গুলী মশাই? কার কথা হচ্ছে?"

"এই আমাদের বড় ঘরের কথা হে।"

বিধু দৈবক ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিল,—'নীলু বাঁড়ুয্যে—নীলু বাঁড়ুয্যে। শেষ বয়সে এক কাণ্ড

বাধিয়ে পিতাহই হাড়ি-কিচ্-কিচির আর অন্ত নেই। পাপ! পাপ! মহাপাপ! আমাদের খনার বচনেই ত রয়েছে—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা মাপৎকালে ঝুপস্থিতে” বলিয়া গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে বিধু দৈবক উঠিয়া চলিয়া গেল।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পা রগড়াইতে রগড়াইতে শশী সরকার কহিল,—“ঠিক ঠিক, খুবই ঠিক। বিধু যা বল্লে—খাঁটি কথা, মহাপাপই বটে!”

গেনীর মা'র গেনী জল লইতে আসিয়া, মুখটি নীচু করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। শশী তাহার উদ্দেশে কহিল,—“চ'লে যাস্ কেন, দিদি? তোর লজ্জা করবার এখানে আর কে আছে? আয়—আয়, এক পাশ দিয়ে নেমে এসে জল নিয়ে যা। একরত্তি দিদিটি আমার, ওর আবার লজ্জা!”

স্নানান্তে ভিজা কাপড়ে বাড়ী ঢুকিয়া শশী সরকার বরাবর রান্না-ঘরের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল,—“ঠিক বলেছে বিধু! অধর্ম্মের ভোগ বই কি! নইলে খনার বচনে পর্য্যন্ত——জানলে বৌ, ভারি বেঁচে গিয়েছি—ভারি বেঁচে গিয়েছি, নইলে—ওঃ! ভগবান্ রক্ষে করেছেন!”

রান্নাঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া গদাইয়ের মা জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ঠাকুরপো?" কিন্তু প্রশ্ন বোধ হয় শশীর কানেই পৌঁছিল না, অন্যমনস্ক হইয়া কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

৪

পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষ দিন কয়টাও কাটিয়া আসিবার মত হইল, তথাপি আকাশের একটি ফোঁটা জলও ধরিত্রীর বক্ষে গড়াইল না। উত্তাপের আর অন্ত নাই। দীর্ঘ দুই মাস ধরিয়া আকাশের পানে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া পৃথিবী যে একটুখানি জলের জন্য নিত্য নিত্য তাহার প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছে, তাহা পায় নাই বলিয়াই আজ যেন অভিমানে তাহার অন্তর-সঞ্চিত সমস্ত উত্তাপ তাহার তপ্ত বক্ষকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া, দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, তথাপি ঘর হইতে বাহির হইবার সাধ্য কাহারও নাই। এমনই সময়ে শশী সরকারের অন্দরের দরজা ঠেলিয়া কাহারা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল,—"বাড়ীতে কারা আছেন গা ?"

ভাঁড়ার ঘরের দাওয়ায় আঁচল পাতিয়া গদাইয়ের মা শুইয়াছিল, মাথা তুলিয়া দেখিল, একটি চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়ের হাত ধরিয়া একটি প্রৌঢ়া

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা, কোত্থেকে আসছ বাছা?"

স্ত্রীলোকটি কহিল,—"নবাইচণ্ডীর মেলা দেখতে গিয়েছিলুম মা, ঘরে ফিরছি। যা রোদ্দুর, তেষ্টায় সারা হয়ে গেলুম মা। আসতে আসতে তিন জায়গায় জল খেয়েছি। একটু ঠাণ্ডা জল দেবে মা আমাদের? তোমরা—আপনারা ব্রাহ্মণ কি?"

"না বাছা, এ কায়েতের বাড়ী। তোমরা?"

"আমরাও কায়েত। এক ঘটী জল দাও মা-লক্ষ্মী।"

খুব বড় এক ঘটী জল আনিয়া গদাইয়ের মা জিজ্ঞাসা করিল,—"মেয়েটি?"

"উটি আমার নাত্‌নী। ঐটিকে নিয়েই ত ওর বাপ ভাবনায় পড়েছে। পনের বছরে পা দিলে, এখনো মেয়েটার কিছু কিনারা করতে পারলে না!"

"নাত্‌নী তোমার খাসা মেয়ে, বাছা!"

শশী সরকার ঘরের মধ্যে শুইয়া শুইয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল। লাফাইয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল এবং মেয়েটির দিকে দেখিতে দেখিতে কহিল,—"আপনাদের বাড়ী কোন্ গাঁয়ে গা?"

স্ত্রীলোকটি কহিল,—"মাকালপুর। মাকালপুরে

গোঁসাই-বাড়ীর কাছেই আমাদের বাড়ী। আমার ছেলে স্কুলে পণ্ডিতী করে কি না!"

"ছেলের আপনার নাম কি?"

"আমার ছেলের নাম ভৈরব। ভৈরব দত্ত।"

শশী সরকার দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং এক টুকরা সাদা কাগজ হাতে লইয়া নিজের মনে বকিতে লাগিল,—"ছোঁড়াটার জ্বালায় আমার কিছু থাকবে না! ওর জন্যে দোয়াতে ত এক বিন্দু কালি থাকবে না। তার পর পেন্‌সিলটাও দেখছি মুখপোড়া নিয়ে কি করেছে!" বলিতে বলিতে আবার বাহিরে আসিল এবং নিজের মনে বার দুই কহিল—'মহাদেব—মহাদেব', তার পর স্ত্রী-লোকটির দিকে চাহিয়া কহিল,—"দত্ত বল্‌লেন, না?"

স্ত্রীলোকটি কহিল,—"হ্যাঁ বাবা, দত্ত। দত্ত হ'ল পদবী, আর ছেলের নাম আমার মহাদেব ত নয়—ভৈরব।"

শশী সরকার কহিল,—"হ্যাঁ; ঐ মহাদেব মনে থাকলেই ভৈরব মনে পড়বে, যে মহাদেব, সেই ভৈরব।"

"তা ত বটেই বাবা" বলিয়া স্ত্রীলোকটি জলের ঘটীটি রোয়াকের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল,—"ভৈরব দত্ত ব'লে স্কুলে গেলেও হবে। ছেলে যদি ওর কাছেই ভর্ত্তি ক'রে

দাও বাবা, ত এমন যত্ন ক'রে পড়াবে যে, তা আর বলবার নয়। নিজের পেটের ছেলে হ'লে হবে কি, সত্যি কথা বলতে গেলে, বিদ্যেতে ত আর ওর মত কেউ নেই। আর না, বেলা প'ড়ে আসছে" বলিয়া নাতনীর হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল।

ইহার দিন সাতেক পরে এক দিন প্রাতঃকালে শশী সরকার কাঁধে চাদর ফেলিয়া, ছাতা ও লাঠি লইয়া গদাইয়ের মাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মাকালপুরে কার বাড়ী সে দিন তারা ব'লে গেল,—শিবু দত্ত,—না?"

গদাইয়ের মা কহিল,—"কি জানি ঠাকুরপো, আমার ত মনে নেই।"

অতঃপর দুর্গা দুর্গা বলিয়া শশী সরকার বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল এবং গদাইয়ের মাকে বলিয়া গেল যে, যেহেতু তাহাকে জমীদারের কাছারীতে যাইতে হইতেছে, ফিরিতে তাহার একটু বিলম্ব হইবে।

৫

মাকালপুরের সখের থিয়েটারের আকড়াঘরে বসিয়া যে কয়জন আকড়াধারী কোন এক জনের বিষয়ে শলা-পরামর্শ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে একজন কহিল,—"আহা, বেচারাকে নিয়ে কেন আর—"

ফোঁস করিয়া বাধা দিয়া একজন কহিল,—"না—না, বুড়োকে নিয়ে মজা একটু কর্ত্তেই হবে" বলিয়া অনন্ত নামে একটি যুবকের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"অন্তা, পারবি ত ? তোকেই কিন্তু সব করতে হবে।"

অনন্ত কহিল,—"এর আর কি,—আমি ত কালই আবার চন্দননগর যাচ্ছি। পারুলের মাকে গড়েপিটে ঠিক ক'রে আসব এখন। মাগী গোটা দশেক টাকা পেলেই আর অমত করবে না, তবে পারুলের বাবুকে একবার জানিয়ে রাখতে হবে।"

"পারুলকে এখন রেখেছে কে ?"

অনন্ত কহিল,—"সে এক মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ দেবতা বল্‌লেও হয়—খাস কামাখ্যার ফেরত।"

ইহার পাঁচ-সাত দিন পরে এক দিন বৈকালে—মাকাল-

পুরের অনন্ত শশী সরকারের বাড়ী খুঁজিয়া খুঁজিয়া আসিল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে আলাপ করিয়া শেষে অনন্ত কহিল,—"গরীব বিধবার মেয়ে তাই, নইলে এমন সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ের সন্ধান পেলে রাজাধিরাজ মহারাজও মালা হাতে ছুটে আসে। নিজের চোখেই ত কাল দেখবেন? দেখবেন, যা ব'লে গেলুম, তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। আর স্বভাব-চরিত্রের কথা আপনাকে আর কি বলবো, কখনো বেটা-ছেলের পা ছাড়া মুখের দিকে চেয়ে কথা কয় না। শিষ্ট, শান্ত, নম্র——তবে গরীবের মেয়ে ব'লে ঠিক সময় বিয়েটা হচ্ছে না, একটু বড় হয়ে গেছে;—তবে আজকাল এ রকম বেশী বয়স চল্ হয়ে গেছে।"

"বেশ বেশ! দেখুন, আপনাকে আর কি বলবো: আমাদের এ-গ্রাম হয়েছে পাজির একশেষ, নইলে—। বেশ; কালই তা হ'লে চলুন, মেয়েটিকে দেখে আসা যা'ক, আমি বড় নিরাশ্রয়েই পড়েছি, কি আর আপনাকে——"

"কিছু আর আপনাকে বলতে হবে না। চার হাত এক ক'রে দেওয়ার মত কাজ জগতে আর কিছুই নেই

সরকার মশাই! এতে আপনারও একটু উপকার করা হবে, গরীব বিধবারও——”

“কিন্তু আপনার ভৈরব দত্তের ছেলের কাণ্ডটা দেখলেন ত একবার। বাড়ীতে আইবুড়ো মেয়ে থাকলেই লোক গিয়ে থাকে, তা ব'লে ঐ রকম ক'রে কেউ কারুকে অপমান করে? শুনিছি, ছোকরাটি থিয়েটারের আড্ডার আড্ডাধারী।”

“ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন। ও সব হ'ল নিরেট, কাণ্ড-জ্ঞানহীন, মুখ্যু, ওদের কথাই আলাদা, তবে ভগবান যা করেন, তা মঙ্গলের জন্যেই। ঐ সূত্রে মাকালপুর যাতায়াত করেছিলেন বলেই ত আজ মধ্যে থেকে এই যোগাযোগের ব্যবস্থাটা হয়ে গেল। যাক, আমি উঠলুম এখন সরকার মশাই, কাল সকালেই আসা যাবে তা' হ'লে।”

অনন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইতে যাইতে কহিল,—“শুধু ঐ একশটা টাকা পাকা দেখার দিন দিয়ে দেবেন। গরীব অনাথা বিধবা, বিয়ের খরচটা——”

বাধা দিয়া শশী সরকার কহিল,—“সে ত বটেই। সে আমি দিয়ে দোবো এখন। আপনার হাতেই দোবো, আপনিই দিয়ে দেবেন, তবে কথা হচ্ছে, অনন্ত বাবু,

এ-গ্রাম আমার অতি জঘন্য. শুভ কাজ হয়ে যাবার আগে, এ কথা যেন আর কারও কাণে——বুঝেছেন ত ?"

"সে আর আপনাকে বল্‌তে হবে না" বলিয়া নমস্কার করিয়া মাকালপুরের অনন্ত রায় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

মেয়ে দেখা হইতেছে।

অপরূপ রূপের ছটায় টিনের ঘরখানি আলো করিয়া কন্যা হেঁটমুখে বসিয়া ছিল।

এ রূপের দেখিবারই বা কি আছে, দেখাইবারই বা কি আছে? কবিই বা ইহার কি বর্ণনা করিবে, চিত্রকরই বা ইহার কতটুকু তাহার তুলির মুখে ফুটাইয়া তুলিবে! লোক যে বলে, রূপ! রূপ! রূপ!—কিন্তু ছাই রূপ! ইহার কাছে আবার রূপ? মানুষের চোখ যদি হয়, তবে এই রূপ দেখিয়া সে চোখ কি আবার কখন অন্য দিকে ফিরাইয়া লইতে পারা যায়! কিন্তু তবুও শশী সরকার চক্ষু নামাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি?"

কোমল গান্ধারে যেন বাঁশী বাজিয়া গেল—"শ্রীমতী পারুলবালা দাসী।"

"লিখতে পড়তে জান?"

"ভাল জানি না, মা'র কাছে একটু একটু শিখেছি।"

আহা—হা! কণ্ঠের বালাই লইয়া মরি রে! এর পরও আবার প্রশ্ন?

"বানান্ কর দেখি—উল্লম্ফন?"

অনন্ত গোঁফে তা দিতে দিতে কহিল,—"বানান্ কর—দ্বিতীয় ভাগ ত তোমার সারা হয়ে গেছে।"

পারুল প্রস্ফুটিত পারুলের মত নতমুখে বসিয়া রহিল। শুধু স্বুবর্ণমণ্ডিত পান্নার দুল দুইটি কর্ণমূলে ঈষৎ দুলিয়া উঠিল। অনন্ত কহিল,—"ছেলেমানুষ, বালক, তাতে চেষ্টা ত তেমন নেই, যা পড়ে, সব ঠিক মনে ক'রে রাখতে পারে না। আচ্ছা, বানান্ তোমায় করতে হবে না পারুল, একটি গান তুমি শশীবাবুকে শুনিয়ে দাও,—দিয়ে তুমি যাও।" তারপর শশী সরকারের দিকে চাহিয়া কহিল,—"কি রকম গলা একবার দেখুন শশীবাবু, বাঁশী ফেলে দিতে হবে। তা'ও শেখবার তেমন স্থবিধে ত পায় নি, গরীব গেরস্তর মেয়ে, এর তার কাছে শুনে শুনে যা' একটু আধটু শেখা! গাও, একখানা ঠাকুরের গান গাও। সেই গানখানা গাও পারুল, সেই 'আমার এ ঘরে'।"

মাথা তেমনই নত করিয়া পারুল গান ধরিল,—

'আমার এ ঘরে আপনার করে—
গৃহ-দীপখানি জ্বাল হে।
সব দুঃখ-শোক (আমার) সার্থক হোক
লভিয়া তোমার আলো হে।'

পর্দ্দায় পর্দ্দায় গানের সুর উঠিয়া, নামিয়া, ঢেউ তুলিয়া যখন তাহার শেষ রেশটুকু কানের মধ্যে মৃদু কম্পনে মিলাইয়া গেল, তখন বুঝা গেল, শশী সরকার সজীব, কিন্তু কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখ হইতে কথা আর বাহির হইল না। কথা যখন বাহির হইল, তখন ইহাই বাহির হইল,—"তা' হ'লে এই মাসের মধ্যেই দিন একটা স্থির করে—"

বাহিরে বদ্ধ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া যে দুই চারিটি যুবতী এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দ হাসিতে পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিল, এইবার তাহারা মুখে আঁচল চাপা দিয়া লুটোপুটি খাইতে খাইতে পারুলের মা'র হাত ধরিয়া টানিয়া ওদিককার বারান্দার দিকে চলিয়া গেল।

*　　*　　*　　*

"বউ!"

"কে ঠাকুরপো? দেখে শুনে এলে?"

"চুপ চুপ! হেবো কোথায়?"

সে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঐ এতক্ষণ আমায় বকিয়ে মারছিল। বলে,—মেসোমশাই কোথা গিয়েছে বল, নিশ্চয় বিয়ে করতে গেছে।

চুপ—চুপ! আস্তে কথা কও।

গদাইয়ের মা গলা খাটো করিয়া কহিতে লাগিল,—এমনি বোকা ছেলে, বলে কিনা—'মেসোমশাশের বিয়েতে আমি ঠিক নিতবর সাজবো'—শুনে ত আর হেসে বাঁচি না। আচ্ছা, ঠাকুরপো, অতবড় ছেলে হ'ল, জ্ঞান-বুদ্ধি একটু—

ছাই—ছাই!—খবরদার, হেবো যেন এ-সবের বিন্দু-বিসর্গও না জানতে পারে, তা হ'লে পাড়ায় ঢি-ঢি হ'তে আর বাকী থাকবে না।—যাক্, গরদের থান তুমি, বউ, এইবার আমার কাছ থেকে আদায় করবে বটে!

কেমন দেখলে, ঠাকুরপো?

সে কথা আর এখন কিছু বলব না। ক'টা দিন এক রকম ক'রে কাটিয়ে দাও, তার পর ত দেখতেই পাবে। বলিহারি কিন্তু কামাখ্যার স্বামীজীকে। বলেছিল যে ধনুর্দ্ধরের তীর আপনার ফুলের গায়ে গিয়ে বিঁধবে, তা ফুলই বটে। ফুটন্ত পদ্ম, বউ ফুটন্ত পদ্ম! কিন্তু খুব সাবধান বউ, খু—উব সাবধান, যেন কেউ না এখন শুনতে পায়!

৭

সেদিনের আকাশের সে অগ্নিময় রুদ্রমূর্ত্তি ঘুচিয়া গিয়াছে। সারা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের অর্দ্ধেকদিন মানুষ হা-জল জো-জল করিয়া সে কাতরতা জানাইয়া আসিয়াছে, এতদিন পরে আজ দেবতার কর্ণে তাহা পৌঁছাইয়াছে।

কাল সারাদিন ধরিয়া আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল, আজ সকাল হইতে বৃষ্টি নামিয়াছে। কয়েক দিন পূর্ব্বের অগ্নিময় ধরণী আজ শীতলতায় ডুবিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হইবার বহুপূর্ব্বেই চারিদিক্ আঁধার করিয়া আসিয়াছিল। অবিরাম বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হু হু করিয়া সজোরে বাতাসও বহিতেছিল।

কালিকার দিন বাদে পরশু শশী সরকারের শুভ-বিবাহ। আজ নির্জ্জন সায়াহ্নে চণ্ডীমণ্ডপে একাকী বসিয়া বাহিরের অজস্র বর্ষণের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া শশী সরকার তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল।

সেই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে ভীষণ দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে গেনীর মা আসিয়া শশী সরকারের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে

কহিল,—"গেনী ত আমার চল্‌লো ভাইপো! জানি না, তুমি তাকে কিছু শাপ দিয়েছিলে কি না! আর একটি-বার গিয়ে তার নাড়ীটা দেখে আসবে চল ভাইপো!"

ভোর-রাত্রি হইতে জ্ঞানদার ভেদ-বমি সুরু হইয়াছিল। ইহার আগেও দুইবার গিয়া শশী তাহার নাড়ী দেখিয়া আসিয়াছে। এ অঞ্চলের মধ্যে তাহার মত নাড়ী-জ্ঞান কাহারও ছিল না।

তখনই গিয়া শশী সরকার গেনীর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই নামাইয়া রাখিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। নাড়ী দেখিবে কাহার?

গেনীর মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শশী সরকার আবার তাহার চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বসিল। মড়া ছুঁইয়া কাপড় ছাড়িবার কথা বা মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিবার কথা তাহার আর মনেই হইল না। সেই অন্ধকারের মধ্যে একাকী শশী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যে সব কথা তাহার মনে কোন দিনই উদয় হয় নাই, আজ এই দুর্য্যোগের সন্ধ্যায় সেই সব কথারই চিন্তা তাহার অন্তরকে ভরাইয়া দিল। শশী ভাবিল, এই গেনীকেই সে বিবাহ করিবার জন্য কত না ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু

এই বিবাহ যদি হইয়া যাইত, যদি গেনী আজ তাহারই স্ত্রী হইয়া তাহার ঘরেই তাহার এই মৃত্যুশয্যা বিছাইত, তাহা হইলে আজ তাহার কি বিপদের দিন হইত, কত বেদনাই না আজ তাহাকে সহ্য করিতে হইত! কিন্তু গেনী তাহার স্ত্রী হয় নাই, আর এক জন, এক দিন পরেই তাহার স্ত্রী হইয়া আসিবে। তেমন রূপসী সর্ব্বগুণময়ী স্ত্রী কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? কিন্তু—কিন্তু—সে-ও যদি গেনীর মত হঠাৎ এক দিন—

সহসা ফটাস্ করিয়া ছাতা বন্ধ করার শব্দ হইল এবং এক হাতে এক বোচকা ঝুলাইয়া একটি আগন্তুক চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিয়া আসিয়া কহিল,—"কি হে শশী, কোন খবর-টবর আর নেই, বলি, ভাল আছ ত সব?"

শশী সরকার চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিয়া সেই অন্ধকারেই চিনিল, তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু কেদার। কেদার শশীরই সমবয়সী। পার্শ্বের গ্রামেই তাহার বাড়ী, তবে কেদার দেশে থাকিত না। বিপত্নীক হইবার পর, ছেলেদের উপর সংসার ফেলিয়া দিয়া কয় বৎসর হইতে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতেছে। বৎসরে একবার করিয়া আসিয়া ছেলেদের দেখিয়া শুনিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়।

কেদার কহিল,—"আজ পাঁচ ছ' দিন হ'ল এসেছিলুম। ভোরের ট্রেণেই যেতে হবে। এই দুর্য্যোগ, রাত থাকতে উঠে, বাড়ী থেকে ট্রেণ ধরতে পারব না, তাই ভাবলুম, শশীর ওখানে গিয়ে রাতটা থেকে, ভোরে উঠে ট্রেণ ধরবো!—তার পর, আছ ত ভাল?"

"আমার আর ভাল আর মন্দ, তুমি কেমন আছ. তাই বল, ছেলেপুলে সব ভাল ত? কালই বৃন্দাবন যেতে হবে?"

"হ্যাঁ ভাই, কালই যাবো। রাধারাণীর পায়ের তলা ছাড়া অন্য কোথাও আর মন টেঁকে না।"

তাহার পর দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাই হইল। কেদার তাহার বাড়ীর কথা, বৃন্দাবনের কথা, সেখানকার অনাবিল আনন্দ ও প্রাণভরা শান্তির কথা, তাহার প্রতি রাধারাণীর অপার কৃপার কথা, একটির পর একটি করিয়া বলিতে লাগিল, আর শশী একান্তমনে নির্ব্বাক্ হইয়া সেই সব কথা শুনিতে লাগিল। শেষে কেদার কহিল,—"ভাই রে, কি দীন-দরিদ্র ছিলুম আমি, আর কি পেয়ে গেলুম, তাই শুধু ভাবি! আমি ত সেই কেদার, দুষ্টু, বদ্‌মায়েস, স্বার্থপর, মহাপাপী, আমার কি-ই বা সম্বল, কিসেরই বা আশা

ছিল ভাই যে, আজ আমি রাধাকৃষ্ণের চরণতলে এমন ক'রে স্থান পাবার অধিকারী হব ? এতটুকু চাইতে গিয়ে যে এতটা পাব, এ ত ভাই কোন দিন ভাবি নি! দয়া—দয়া—সকলই তাঁর দয়া রে ভাই !" একটুখানি থামিয়া আবার কেদার কহিতে লাগিল,—"কি অসার মিথ্যে নিয়েই যে পড়েছিলুম ! বিষয়-সম্পত্তি, মামলা-মোকদ্দমা, রোগ-ভোগ, ছুটোছুটিতে যেন হাঁপিয়ে উঠে প্রাণান্ত হবার যো হয়েছিল ! তার পর দয়াল ঠাকুর তাঁর হাতের কলটি ঘুরিয়ে দিলেন আর অমনি আসল বস্তুটি দেখতে পেলুম ! এই আসল, সত্য, নিত্য বস্তুটি ঠাকুর আমার সকলকেই ঠিক দেখিয়ে দেন, আমরা কেউ দেখি না, কাণা হয়ে ব'সে থাকি ! দয়া তিনি সকলকেই করেন, তাঁর দয়াকে ছু'হাত দিয়ে ঠেলে রাখি, এমনি আমরা অধম ! মিথ্যা যেটা—সেটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে এতই আমরা ভালবাসি যে, তা আর কি বলবো। চোখের সামনে তার অসারতা দেখছি, তবুও আমাদের ঘোর কাটে না, শশী। তাই বলি ভাই, রে, তাঁর দয়াতে ঘোর ছুটে এ যেন এক নবজীবন পেয়ে গেছি, বলিয়া কেদার তাহার যোড়হাত সসম্ভ্রমে কপালে ঠেকাইল।

খানিক পরেই ভিতর হইতে আহারের ডাক আসিতে দুই বন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইল।

আহারাদি হইয়া গেলে কেদার কিছুতেই বাড়ীর মধ্যে শুইতে চাহিল না, অগত্যা চণ্ডীমণ্ডপেই তাহার শয্যার ব্যবস্থা হইল। তখনও বৃষ্টি থামে নাই, তবে বাতাসের বেগ তখন কমিয়া আসিয়াছিল।

শশী সরকার আসিয়াও শুইয়া পড়িল, কিন্তু ঘুমাইল না! শয্যায় শুইয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিল। সাড়া রাত্রি ধরিয়া সহস্র রকমের চিন্তা করিয়া, শেষ রাত্রিতে শশী সরকার বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। বাহিরে তখনও টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

দেওয়ালে বুদ্ধের গৃহত্যাগের যে ছবিখানা ঝুলিতে ছিল, হেরিকেনের ক্ষীণ আলোটা তাহারই উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। শশী ছবিখানির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। নির্নিমেষ নয়নে বহুক্ষণ ধরিয়া ছবিখানির দিকে চাহিয়া রহিল, ভাবিল—রাজা, এমন স্ত্রী, পদ্মের মত সন্তান, সব ত্যাগ ক'রে রাজার ছেলে যেতে পারলে, আর আমার কেউ-ই নেই, আমি——। শশী আসিয়া

আবার বিছানার উপর বসিল। তখনও রাত্রি-শেষের অনেক বিলম্ব ছিল। কিন্তু সহসা এক অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটিল। হাবু বাহ্যে-বমি করিতে শুরু করিল। শশী সরকার শিহরিয়া উঠিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল।

এমন অবস্থায় কেদারের আর সে দিন যাওয়া হইল না। শশী ও কেদার উভয়ে প্রাণপণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন সুফলই হইল না, বেলা যত বাড়িতে লাগিল, হাবুর রোগও তত বাড়িতে লাগিল। শেষে শশী একরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল; তথাপি চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইল না। কিন্তু সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া, বেলা-শেষের সঙ্গে সঙ্গেই হাবুর একরত্তি প্রাণ অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত দিন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মেসো মশায়ের কোলের উপরই ছোট্ট মাথাটি রাখিয়া হাবু চিরদিনের মত চক্ষু বুজিল।

* * * * *

রাত থাকিতে কেদার ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিল এবং এক হাতে ছাতা ও আর এক হাতে পোঁটলা লইয়া নিঃশব্দে সদর-দরজা খুলিয়া চলিয়া

যাইতেছিল, পিছন হইতে শশী সরকার আসিয়া কহিল, —"যাচ্ছ? দাঁড়াও, আমিও যাব।"

পিছন ফিরিয়া থতমত খাইয়া কেদার কহিল,—"কে? শশী?—কোথায় যাবে?"

"বৃন্দাবন। একটু দাঁড়াও, গদাইয়ের মাকে আর একটা কথা ব'লে আসি," বলিয়া হাতের কেম্বিসের ব্যাগটা মাটির উপর রাখিতেই গদাইয়ের মা চোখ মুছিতে মুছিতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। শশী তাহার দিকে চাহিয়া কহিল,—"বউ, আজ একুশে, আমার শুভ বিবাহের দিন। অনন্ত এলো বোলে, এক বড় বিয়ের সন্ধান পেয়েছি, সেই উদ্দেশেই আমি চললুম" বলিয়া ব্যাগটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইল।

হট্টমালার যুগ

—স্যাণ্ডেলের জন্মরহস্য—

গভীর বন। তবে সে বন শাল-তমাল-তাল-পিয়াল-অশ্বত্থ-বট প্রভৃতি দ্রুমরাজিশোভিত নহে। এক সময়ের সযত্নে তৈয়ারী খিড়কীর পুষ্পোদ্যান, বর্ত্তমানে পুষ্পবৃক্ষশূন্য হইয়া, নানাশ্রেণীর পরিচিত এবং অপরিচিত বন-জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কাননমধ্যস্থ একটি ইষ্টকনির্ম্মিত গোলাকার বেদী, সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য ফাটল লইয়া এখনও কোন রকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তাহার চারি পার্শ্বের স্থানসমূহ বন্য লতাগুল্মে আচ্ছন্ন হইলেও, পাড়ার ছেলে-মেয়েদের 'লুকোচুরি' প্রভৃতি খেলার কল্যাণে জরা-জীর্ণ বেদীমূল এবং বাহির হইতে সং-পোদাশ যাইবার সঙ্কীর্ণ পথ-রেখার উপর এখনও কেহ সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের ঢাকিয়া ফেলে নাই।

উপরি-বর্ণিত স্থান।

কাল গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ।

পাত্র—কেহ নাই। তৎপরিবর্ত্তে আছে, পাত্রী—শ্রীমতী উমারাণী দাসী। তাঁহার মুখে বিষাদ, চক্ষুতে জল, মাঝে মাঝে বুক ভাঙ্গিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। চরিত্রহীন স্বামী কর্ত্তৃক নিত্য নির্য্যাতিতা উমা আজ দ্বিপ্রহরে স্বামী-দেবতার কোন একটা অন্যায়ের সামান্য একটু প্রতিবাদ করিবার ফলে, বীর-দেবতা তাহার মস্তকের দীর্ঘ কেশাকর্ষণ করিয়া, পাদুকা প্রহরণ দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত করিয়াছে। তাই সে খিড়কীর পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিবার ইচ্ছায় প্রথমে এখানে আসে; কিন্তু ডুবিয়া মরিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিয়া, জঙ্গলাকীর্ণ বাগানের এই নির্জ্জন স্থানটায় বসিয়া, চোখের জল ও দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবিয়া মরিতেছিল। এমন মরণ প্রায় নিত্যই তাহাকে মরিতে হয় আর মরিতে মরিতে নিত্যই সে আর এক অ-দেখা দেবতাকে ডাকিয়া মনে মনে বলে—"ঠাকুর, আর অত্যাচার সহ্য করতে পারি না; তোমার কোলে টেনে নাও, দয়াময়!" দয়াময় কিন্তু কোনদিনই তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। আজিকার দুঃখটা

প্রথম অংশ

—'Wanted a স্বামী'—

উক্ত সময়ের পর দীর্ঘ ৩২ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

৩২ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে যে জীর্ণ বাড়ীটিতে সাপ্তাহিক পত্রিকা—'প্রচণ্ড সমাচার-সমুদ্রে'র আফিস ছিল, ঠিক সেই বাড়ীটির পরিবর্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত সংস্করণে এক্ষণে সুবিখ্যাত দৈনিক 'সোনালী-পত্রে'র আফিস বসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র পল্লী-সদৃশ সেই ত্রিতল বাটীখানির কক্ষে কক্ষে দিবারাত্র মনুষ্য সমাগম ও কোলাহল। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত এবং সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তথায় আর কার্য্যের বিরাম নাই। কোন কক্ষে প্রেসের ঘড়-ঘড়ানি, কোন কক্ষে টাকার ঝনঝনানি, কোথাও সম্পাদক-মণ্ডলীর আলাপ-আলোচনার ফোয়ারা, কোথাও বা চাকর-বাকর-দের দ্বন্দ্ব এবং ঝগড়া। শুধু কেরাণীবাবুদের বৃহৎ হল-ঘরখানি কোলাহলশূন্য। তথায় ডজন দুই বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন প্রকারের বাবুর দল ঘাড় গুঁজিয়া নীরবে একনিষ্ঠভাবে সাদার উপর কালি পাড়িয়া যাইতেছেন।

ত্রিতলের একখানি দরজার উপর পিতলের ফলকে লেখা ছিল—Box Office (বক্স অফিস)। তন্মধ্যে একটি বাবু সম্মুখস্থ টেবলের উপর পা তুলিয়া দিয়া, চেয়ারের উপর একাকী বসিয়া ঘন ঘন হাই তুলিতে তুলিতে বেহারার উদ্দেশে কলিং বেলে ঘা দিলেন। যে প্রবেশ করিল—সে বেহারা নয়, একজন বেহারী ভদ্রলোক। ঢুকিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন—বক্স নং একশো ছত্রিশ—যো বিগোয়াপোন্ নিক্‌লা হুয়া, হাম উসিকো ওয়াস্তে—

ও ত শ্রেফ্ বাঙ্গালীকা আস্তে।

ওহি বাত্ হাম্ পুছনে আয়া থা। গুড্ বাই।

বেহারী ভদ্রলোটী বাহির হইয়া যাইবার পর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বাঙ্গালীবাবু প্রবেশ করিলেন।

মশাই, বক্স নম্বর ১৩৬—

Wanted a স্বামীর বিজ্ঞাপনের কথা বলছেন ত? আপনি নিজেই candidate (ক্যাণ্ডিডেট্) কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই য়্যাপ্লিকেশন আমি লিখে এনেছি।

দিয়ে যান। আপনার age (এজ) হবে কত? ত্রিশের বেশী বলেই যেন মনে হয়।

আজ্ঞে না। আমার ঠিকুজি আছে। কোর্টের এফিডেবিটের দরকার হ'লে, তা'ও না হয়—

ব্যবস্থা করিতেছি। হয়ত, তুই একজন পুরুষের 'ফ্লাই গোঁফ' দেখা যাইবে, কিন্তু তাহাকে গুম্ফ বলিয়াই মনে হইবে না ; মনে হইবে, যেন মকরন্দ অভিলাষে মধুকর আসিয়া ওষ্ঠ-পল্লবে স্থিরভাবে বসিয়া আছে।

স-খেদে উমা কহিল—"রমণীর সুকোমল ওষ্ঠকে ঠেলিয়া রাখিয়া পুরুষের কঠিন ওষ্ঠের সহিতই আপনি পল্লবের উপমা দিতেছেন?"

তখন সেই পুরুষরাই রমণীস্বরূপ হইবে, উমা। তুমি দুঃখিত হইও না।

ভাল। কিন্তু কিরূপ পাদুকা আমাদের দিবার ব্যবস্থা করিবেন? খোঁপার ফিতা-বাঁধা আমাদের অভ্যাস থাকিলেও, দীর্ঘ কেশের সঙ্গে খোঁপা-বাঁধার হাঙ্গামা যদি আমাদের উঠিয়া যায়, তাহা হইলে জুতার ফিতা বাঁধা আমাদের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর এবং অসুবিধার হইবে, ঠাকুর।

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"তোমাদের যে জুতা দিব, তাহাতে ফিতা বাঁধিতে হইবে না, এবং সম্পূর্ণ শ্রীচরণও তাহাতে বাঁধা পড়িবে না। সে জুতার ফাঁকে ফাঁকে, তোমাদের অমল-কোমল-ধবল কিম্বা শ্যামল মধুর চরণের শ্রী উঁকি দিয়া দেখা দিবে এবং তন্মধ্যে তোমাদের

পদ-রেণুরও অভাব ঘটিবে না। সে জুতার নাম হইবে—'স্যাণ্ডেল।'

হর্ষোৎফুল্ল-নয়নে দেবতার মুখের প্রতি চাহিয়া উমারাণী জিজ্ঞাসা করিল—"কতদিনে আপনার এই নতুন বিধি-ব্যবস্থা ধরায় প্রচলিত হবে ?"

শীঘ্রই। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তোমাদের দুইজন স্বামী-স্ত্রীর কাল পূর্ণ হইবে। তখন উভয়েই সেই নবযুগে, নবালোকপ্রাপ্ত ও উন্নত এই দেশে আসিয়া আবার জন্ম পরিগ্রহ করিবে।

আবার স্বামী-স্ত্রীরূপে ?

আর উত্তর আসিল না। উমা মুখ তুলিয়া দেখিল—দেবতা অদৃশ্য হইয়াছেন।

বোধ হয় উমার চরমে উঠিয়াছিল। তাই শুধু কর্ণপাত নয়, উমার কাতর আহ্বানে ঠাকুর একবারে সশরীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন —"মা, সকলই দেখিতেছি, বুঝিতেছি। পুরুষকে পাদুকা এবং নারীকে দীর্ঘ কেশরাশি দিয়া আমি মস্ত একটা ভুল করিয়াছি। পুরুষ অন্তঃপুর মধ্যে বীরত্বে পরিপূর্ণ হইলেই, প্রায়ই তাহার পাদুকা দ্বারা নারীর দীর্ঘ কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার কোমল অঙ্গে প্রহার করিয়া থাকে,—এ ঘটনা নিত্যই নানাস্থানে নানাভাবে আমার চক্ষুর গোচর হইতেছে।"

ভক্তি-গদগদ-ভাবে উমা কহিল—"সুতরাং আপনি ইচ্ছা করিলে এই দুই দ্রব্যের—অর্থাৎ পুরুষের পাদুকার ও নারীর দীর্ঘ কেশের বিলোপসাধন করিলেই ত পারেন?"

তা পারি; কিন্তু করিব না। কারণ, আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের নিম্নতম অঙ্গ—পা, এবং উর্দ্ধতম অঙ্গ—মস্তক। মনুষ্য এই দুইয়ের প্রভাবে—অর্থাৎ পদভরে এবং মস্তিষ্ক-চালনায় সারা পৃথিবী যে টলটলায়মান করে, তাহা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে গৌরবের। সুতরাং এমন যে পা এবং মস্তক, তাহার শোভা পাদুকা এবং দীর্ঘ

কেশ। এই দুইটি দ্রব্য আমি পক্ষপাতশূন্য হইয়াই নর এবং নারীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু সেই ভাগেই আমার ভুল হইয়াছিল। এক্ষণে আমি মনস্থ করিয়াছি, আমার ঐ ভুল সংশোধন করিয়া লইব।

উমা সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল—"কিরূপে সংশোধন করিবেন?"

আমি নারীর দীর্ঘ কেশরাশি গুচ্ছাকারে পুরুষকে এবং পুরুষের পাদুকা নারীকে অর্পণ করিব। তবে নারীর এই নূতন পাদুকা, ইচ্ছা করিলে পথে, ঘাটে, গৃহে পুরুষও ব্যবহার করিতে পারিবে, যদি তাহাতে নারীর কোন আপত্তি না থাকে।

বিনয়-নম্র বচনে উমা নিবেদন করিল—পুরুষের কেশাধিক্যের হিংসায় নারীর আবার না ক্লেশাধিক্য ঘটে, সে-বিষয়ে আপনার একটু লক্ষ্য রাখা উচিত, কেন না, একেই ত মুখমণ্ডলে পুরুষকে গুম্ফ-শ্মশ্রুরূপে আপনি যথেষ্ট কেশ দান করিয়াছেন।

সে বিষয়েও আমি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। পুরুষদের যেমন নারীর দীর্ঘ কেশের অধিকারী করিতেছি, পুরুষের উক্ত গুম্ফ-শ্মশ্রুরূপ আপদেরও তেমনি শাস্তির

আচ্ছা, দরখাস্ত দিয়ে যান।

দরখাস্তখানি লইয়া Box-বাবু বক্রদৃষ্টির দ্বারা দ্বিতীয় আগন্তুক বাবুটির আপাদমস্তক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন এবং আর একবার জোরে কলিং-বেলে ঘা দিলেন। এবার জোরে 'কিড়িং'-এর ফলে বেহারা ছুটিয়া আসিল, Box-বাবু তাহাকে চায়ের ফরমাজ করিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে চা ও চাকরের সঙ্গে সঙ্গে আর এক আগন্তুক তাঁহার ঘরে উদয় হইল।

অদ্যকার 'সোনালী-পত্রে' নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটী বাহির হইয়াছিল :—

Wanted a স্বামী

এক জন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সুকোমল, সচ্চরিত্র, ভাবী-পত্নীগতপ্রাণ, গ্রাজুয়েট্ স্বামী আবশ্যক। তাঁহার বয়স ২৫এর কম এবং ৩০এর বেশী না হয়। আবেদনকারী পিতৃ-মাতৃহীন হওয়া আবশ্যক। যাঁহার বর্ত্তমান আয় অধিক এবং পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ প্রচুর, তাঁহারই আবেদন সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইবে। কন্যা—under-graduate, অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী, নৃত্য-গীতে দক্ষ, ক্রিকেট ও টেনিসে সিদ্ধহস্ত। সর্ব্ববিধ কলা-বিদ্যায় well-accomplished। মোটের উপর কন্যা

সর্ব্বতোভাবে নব্যা, ভব্যা এবং লোভ্যা—অর্থাৎ লোভনীয়া। বয়স ২৩। সবিস্তার বিবরণ—এবং স্ব স্ব ফটো সহ দরখাস্ত—'বক্স নং ১৩৬, সোনালী-পত্র' এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

অদ্য প্রাতে উপরি-উক্ত বিজ্ঞাপন বাহির হইবার পর, দলে দলে উমেদারের পর উমেদার এবং দরখাস্তের পর দরখাস্তের প্রবল বন্যা আসিতে আরম্ভ হইয়াছে।

দ্বিতীয় আগন্তুক বাবুটি বাহির হইয়া গেলে, নূতন আগন্তুক যিনি আসিলেন, তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ। ক্যাম্বিসের জুতা হইতে সুরু করিয়া, পরিধেয় বস্ত্র, পিরাণ, উত্তরীয়, মস্তকাবরণ এবং ছাতার কাপড় সবই গেরুয়ায় রঞ্জিত। মস্তক ক্ষুর-মুণ্ডিত—কেশশূন্য। তাঁহার নাম নকলানন্দ স্বামী। দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়াই তিনি কহিলেন—'Wanted a স্বামী' ব'লে আজকের কাগজে যে বিজ্ঞাপনটা বার হোয়েছে—

Box-বাবু টেবলের উপর হইতে প্রসারিত চরণ-যুগল গুটাইয়া লইয়া স্বামীজীকে তাঁহার বাকী কথা বলিবার অবসর না দিয়া, মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন—বিজ্ঞাপন-টার সবটা আপনি পড়েছেন কি?

না ! একজন সংবাদ দিলেন যে, বক্স ১৩৬-এ এক জন স্বামীর প্রয়োজন। তাই——

সংবাদটা এক দিকে ঠিক, আর এক দিকে বেঠিক। স্বামী মানে এখানে হাস্‌ব্যাণ্ড—পতি, 'ওয়াইফে'র ম্যাস-কুলা—

ওঃ! বুঝিছি ; আমি মনে করেছিলুম, বুঝি কোন নতুন মঠ বা মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তারই জন্যে—আচ্ছা, নমস্কার।

যেমন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তেমনই ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিয়া স্বামীজী চলিয়া গেলেন। বক্স-বাবুও ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে চুমুকে চুমুকে চা পান করিতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময়ে রূপের তরঙ্গ তুলিয়া এক সুন্দরী তরুণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুন্দরীর পরণে নীল-শাড়ী, গায়ে নীলাভ সিল্কের ব্লাউজ, কর্ণে নীল দুল, পায়ে সোনালী স্যাণ্ডেল। মাথার কুঞ্চিত রুক্ষ কেশদাম—কতক গ্রীবাদেশ, কতক কপালের উপর, কতক কর্ণমূলে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই হ্রস্ব কেশগুচ্ছমধ্যস্থ তরুণীর ঢল-ঢল, সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মনে হয়, একটি পূর্ণ-বিকসিত স্থলকমল, চারিপার্শ্বের অন্ধকার-

রাশিকে জড়াইয়া ধরিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তরুণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই—গুড্ মর্ণিং মিষ্টার সেন।

বক্স-বাবু এস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—গুড্ মর্ণিং, আসুন। আপনার কথাই ব'সে ব'সে ভাবছিলুম।

মৃদু হাসিতে হাসিতে তরুণী কহিল—দেখছি, সকলেই আমার কথা ব'সে ব'সে ভাবেন। সুতরাং ভাগ্যটা আমার ভাল।

সত্যই আপনার ভাগ্য খুব ভাল, মিস্ ঘোষাল। তার সাক্ষী এই দেখুন। বলিয়া বক্স-বাবু সম্মুখস্থ ড্রয়ারের মধ্য হইতে একতাড়া দরখাস্ত বাহির করিলেন ও তন্মধ্য হইতে বাছিয়া একখানা দরখাস্ত ও একখানা ফটো, মিস্ ঘোষালের হাতে দিয়া কহিলেন—"দি মোষ্ট ডিসায়ারেবল্ ক্যানডিডেট্ য়্যামং দি হোল্ ক্রাউড।"

মিস্ ঘোষাল ভাঁজ-করা দরখাস্তখানা বাঁ-হাতে ধরিয়া, ডান হাতে ফটোখানা লইয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিল—"এঁর নাম কি?"

কুঙ্কুম রায়।

দ্বিতীয় অংশ

—পূর্ব্বরাগ—

তোমরা দু'জনে ব'সে ব'সে কথা কও, বাবা, আমি তোমাদের জন্যে চা ক'রে আনি। স্নেহপূর্ণ-কণ্ঠে মিসেস্ ঘোষাল শ্রীমান্ কুঙ্কুমকে উপরি-উক্ত কথা কয়টি বলিয়া ভিতরের দিকে উঠিয়া গেলেন।

কুঙ্কুম ঝরণার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—শ্রাবণের 'তরুণলেখায়' আপনার—'হিয়া কেঁদে মরে কাহার তরে' প'ড়ে আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলুম—একজন genius (জিনিয়স)। ঝরণা ঘোষাল, এ-নামটা কাগজের পাতাতেই তখন দেখেছিলাম আর সেই সঙ্গে তাঁর চেহারাটার যে-একটা কল্পনা ক'রে নিয়েছিলাম, আজ সত্যিকারের ঝরণা ঘোষালের চেহারার সঙ্গে হুবহু তা মিলে যাচ্ছে। কবিতা এত deep (ডিপ) এর আগে আমি পড়ি নি। কি sublime (সাবলাইম)! কি grand (গ্র্যাণ্ড)!

মিস্ ঝরণা ঘোষাল সে দিনের মতই বেশ-ভূষায় সজ্জিতা। অধিকন্তু আজ সেই নীল শাড়ীতে একটি ছোট

'নার্সিসাসে'র গুচ্ছ পিন-বদ্ধ হইয়া তাহার বুকের উপর শোভা পাইতেছিল। ঝরণা কহিল—আমিও কুঙ্কুম বাবু, আপনার গল্পের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সে দিন আপনার 'চ'লে যেতে পড়ি ঢ'লে' পড়ে মা আর আমি হেসে হেসে ম'রে যাই।

'Wanted a স্বামী'র বিজ্ঞাপনের ফলে এই দুই তরুণ-তরুণীর মিলন ঘটিয়াছে। শুধু বাহিরের মিলন নয়, অন্তরের মিলনও হইয়াছে। কেবল পুরোহিতের দু'টা মিলন-মন্ত্র উচ্চারণের যা বাকী। শীঘ্রই এক শুভ রজনীর শুভ মুহূর্ত্তে সেই বাকী কাজটুকু সুসম্পন্ন হইয়া, এই দুই পবিত্র এবং ঈপ্সিত আত্মার পরম মিলন সংঘটিত হইবে। শ্রীমান্ কুঙ্কুম প্রত্যহই নিয়মিত সময়ে, তাহার ভাবী-পত্নী-সকাশে প্রকাশ হইয়া সুখের ও আনন্দের সুগন্ধ বিকীর্ণ করে, আর শ্রীমতী ঝরণা, সহজ, সরল, চপল গতিতে, রূপের ঝিকি-মিকি অঙ্গে ধরিয়া তাহার মিলনের পথে হাসিয়া, গাহিয়া, নাচিয়া চলে। তাই মিসেস্ ঘোষালের আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই। ঝরণা তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়,—সাত রাজার ধন মাণিক। তাহাকে গর্ভে ধরিবার জন্যই যেন তিনি ত্রিশ বৎসরের কুমারী জীবনের অন্ত করিয়া, মিস্ গুপ্তা নাম

ঘুচাইয়া, দুই বৎসরের জন্য, মিসেস্ ঘোষাল নামটি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং কন্যার জন্মের পর, স্বামী অবিচারে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও, পতি-পরিত্যক্তা, সাধ্বী স্ত্রী আজ পর্য্যন্ত স্বামীর পদবীর ছাপ আপন নাম হইতে পরিত্যাগ করেন নাই। যে ঝরণাকে বুকে চাপিয়া এ যাবৎ কত সুখ, তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কত গভীর মনোবেদনা, কত অসহ্য দুঃখ তিনি সহ্য করিয়া আসিতেছেন, সেই ঝরণাকে তিনি মনোমত করিয়া মানুষ করিয়াছেন, এবং এত দিন পরে, তাঁহার সেই অতি বড় আদরের ঝরণার উপযুক্ত স্বামী মিলিয়াছে।

যেমন ঝরণা, কুঙ্কুমও তেমনই। রাজ-যোটক। বিপত্নীক সব-জজ পিতা, তাহার একমাত্র পুত্রটিকে, বৃহদাকার না হউক, মধ্যমাকার টাকার স্তূপের উপর বসাইয়া দিয়া সম্প্রতি স্বর্গীয় হইয়াছেন। ঠিক গ্রাজুয়েট না হইলেও, আই-এ দিবার পর, বার বার তিন-বার গিয়া কুঙ্কুম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় দ্বার বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিল। আকৃতি—সুন্দর, দেহ—সুগঠিত, কার্ত্তিকের রূপলাবণ্য-সংযুক্ত; শ্রী মনোমুগ্ধকর। এ সমস্ত ছাড়া, নিত্য সিনেমা-যাত্রী; কবিতার সমজদার;

এবং গল্পের লেখক। সুতরাং এই তরুণ-তরুণীর শুভ মিলন, প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষার ধন, বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ।

মিসেস্ ঘোষাল ঝিয়ের হাতে চা ও জলখাবার চাপাইয়া বাহিরের ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিতেই, সদরের ফটক খুলিয়া তাঁহার পিছন পিছন আর এক ব্যক্তি ঈষৎ টলিতে টলিতে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—বৌমা, বড় সময়ে এসে পড়েছি। তোমার ঐ রাবিস মিষ্টি-ফিষ্টি, এখন এ মুখে আর আমার ভাল লাগবে না, নিম্‌কি দু-একখানা না-হয় দিতে পার, কিন্তু চা একটা কাপ নইলে নয়। তার পর ঝরণার দিকে চাহিয়া কহিল—জয় হোক্ দিদি-রাণী! আরে, নাতজামাই যে! বাঃ—বাঃ—কেয়া তোফা! লোকটি থপ্ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং তাহার শেষ কথাটার রসিকতার সূত্রে ঝরণা ও কুঙ্কুমের মুখের দিকে যেন মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

লোকটি এই পাড়ারই একজন। কিছু বিষয়-সম্পত্তি—অর্থাৎ খান তিনচার বাড়ী আছে, তাহারই আয় হইতে সচ্ছলে সংসার চলিয়া যায়, অন্য কাজকর্ম্ম কিছুই করেন না। কথা-বার্ত্তা ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতি একটু সেকেলে গোছের,—অর্থাৎ কাছার সবটাই গোঁজেন, গোঁফের সব-

টাই রাখেন, চুল-ছাঁটা সম্বন্ধে সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগের প্রতি পক্ষপাতশূন্য, পাঞ্জাবীর বোতাম চারিটার মধ্যে গলার বোতামটা শুধু আঁটা নয়—সর্ব্বাগ্রেই আঁটেন, চোখ ভাল থাকিলেও চশমা লয়েন নাই এবং দর্জ্জিকে সেলাই-য়ের পূরা দাম দিয়া জামার পূরা ঝুলই রাখিয়া থাকেন। এ সমস্ত ছাড়া আর একটি তাঁহার মন্দ অভ্যাস আছে। মাঝে মাঝে একটু 'ইয়ে' খান; হুইস্কি সেরির ধার দিয়া যান না, একেবারে খাঁটি স্বদেশী—এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয়নকক্ষে খিল লাগাইয়াও খান না। একমাস দেড়-মাস অন্তর খান, কিন্তু যখন খান, তখন তাঁহার সেই পান-যজ্ঞে উদর-দেবতার বাকী প্রাপ্য আহুতি ভাল করিয়াই পোষাইয়া দিয়া থাকেন; অর্থাৎ একবার সুরু করিলে উপর্য্যুপরি তিনচারি দিন ধরিয়া তাহা সমানেই চলিত। কিন্তু বেহুঁশ তিনি কখনই হইতেন না, এবং কথা কিংবা মন্তব্য, স্পষ্ট ছাড়া অস্পষ্ট কখনই তিনি বলিতেন না; তবে, হয়ত তাহাতে রসের কিছু রসান থাকিত মাত্র।

নাম তাঁহার যাহাই থাকুক, মিসেস্ ঘোষালের তিনি 'নেড়া মামা' হন। কিন্তু মায়ের নেড়া মামাকে ঝরণাও যে কোন্ হিসাবে 'নেড়া মামা' বলিয়া ডাকে, তাহা বিশেষ-রূপ গবেষণা ছাড়া বলিবার উপায় নাই। 'নেড়া মামা'

কিন্তু নাতিনী হিসাবে তাহাকে 'দিদিবাবু' বলিয়াই ডাকিয়া থাকেন।

'কেয়া তোফা' বলিয়া নেড়া মামা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িতেই, মিসেস্ ঘোষাল ঝরণাকে কি-একটা ইসারা করিয়া কহিলেন—বসুন নেড়া মামা, ওরা একটু বায়স্কোপ দেখতে যাবে কি না, তাই একটু তাড়াতাড়ি করছি। ছ'টায় শো বিগিন্—আর বেশী দেরী নেই। চা-টা খেয়ে নিয়ে চট্ করে এসে কাপড়টা ছেড়ে নে, ঝরণা। বলিয়া মিসেস্ ঘোষাল ব্যস্ত হইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই খাবারের থালাখানা টানিয়া লইয়া নেড়া মামা কহিলেন—দেরী বিন্দুমাত্র আমিও করাব না, দিদি-মণি। থালায় যে কয়খানি নিম্‌কী এবং সিঙ্গাড়া ছিল, অতি দ্রুত সেগুলি শেষ করিয়া, টিপট হইতে এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইয়া পান করত নেড়া মামা কুঙ্কুমের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—ধূমের ব্যবস্থা কিছু সঙ্গে আছে বাবাজী—সিগারেট, কি বিঁড়ি টিড়ি কিছু? আচ্ছা থাক্, তোমাদের দেরী হয়ে যাবে। আমি চল্লুম তাহলে দিদিবাবু,—গুড্ বাই।

দ্রুতগতি নেড়া মামা অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে, পথের দিকের খোলা জানলার ফাঁকে আবার নেড়া মামার মূর্ত্তি প্রকট হইল। মুখ বাড়াইয়া তিনি কহিলেন—বায়স্কোপ দেখার বদলে, তু'জনে মিলে বায়স্কোপের ফিল্ম তুলছ নাকি, দাদাবাবু দিদিমণি ?

সদর ঘুরিয়া তিনি ভিতরে আসিয়া বসিলেন, কহিলেন—বউমা তখন আমায় ধাপ্পা দিয়ে কেমন সুন্দর-রূপে ভাগিয়ে দিলেন, পাছে তাঁর কন্যা-জামাতার মধুর সদালাপে—

ঝরণা বলিয়া উঠিল—সত্যি না, নেড়া মামা; দক্ষ-যজ্ঞটা দেখে আস্‌বো বলে আজ সিট্ রিজার্ভ পর্য্যন্ত করে-ছিলুম, কিন্তু শেষকালে দেখলুম—

যে 'দক্ষ-যজ্ঞ'টা নেহাৎই 'দক্ষ-যজ্ঞ', তার বদলে, তু'টিতে মিলে এই মধুর সন্ধ্যায় গল্প-যজ্ঞ করলে লাভ আছে ;—তাই না ?

কুঙ্কুম কহিল—না সত্যই আমরা বায়স্কোপে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ ওঁর মাথাটা বড্ড ধ'রে উঠল, তাই উনি—

নেড়া মামা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—দাদাবাবুর কি গভীর পত্নীপ্রেম ! বিয়ে না হোতেই—

'ওঁর—উঁনি'। দেখো ভায়া, সুর ঠিক বজায় রাখা চাই। তা থাকবে। উনি অতীব সৎ কন্যা, সর্ব্ববিদ্যাতেই ওঁর আসাধারণ পারদর্শিতা,—এই নাচ বল, গান বল, ক্রিকেট বল, টেনিস বল,—তার ওপর সাইকেল, সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া, কবিতা লেখা ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বভাবটি সুমধুর। আর মধুর রূপটি দেখে যে না ভোলে, সে নিশ্চয়ই মানুষ নয়—হয় দেবতা, নয় অপদেবতা।

ঝরণা কৃত্রিম রাগের সহিত কহিল—ইচ্ছে করে, নেড়া মামা, আপনার মুখটা কিছুদিন সেলাই করে রাখি।

বিশেষ ক্ষতি নেই। নাক দিয়ে খাব আর কথা কইব। কিন্তু তখন নাকি সুরের কথা শুনে, ভূত ভেবে যেন আঁৎকে মূর্চ্ছা যেও না। তবে নেহাৎ-ই যদি সেলাই কর ত ঐ কমল সুন্দর হাতে সিল্কের সুতো দিয়ে ক'রো দিদিমণি, ঠোঁট আমার সার্থক হয়ে যাবে।

. কুঙ্কুম মৃদু হাসিয়া কহিল—মামা দেখছি রসিকতায় অদ্বিতীয়।

তোমার গিন্নীটিও বড় কম যান না। সময় এলেই তা জানতে পারবে। যাই হোক, দাদাবাবুর খুব জোর ভাগ্য যে, সাক্ষাৎ স্ত্রী-রত্নকে বধূরূপে লাভ করলে। কিন্তু কাজটা হচ্ছে কবে? আমার যেন আর দেরী সইছে না!

আজ্ঞে, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

উত্তম, উত্তম। ঝরণা, পেট ভরিয়ে সে দিন খাইয়ে দিও, দিদি। কেলনার-ফেল্‌নারে আমার দরকার নেই,—ডজনখানেক দিশী হলেই আমার চলবে। তবে পুরো বারো বোতলের কম যেন না হয়; কেন না, তোমার বিয়েতে তিন দিন ধ'রে ওই খেয়েই কাটাবো, আর কিছু খাব না।

কুঙ্কুম ও ঝরণার মধুর খিল্ খিল্ হাসিতে ঘরের বায়ু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

তৃতীয় অংশ

—মিলন—

মিলন হইয়াছে।

গত জ্যৈষ্ঠের এক শুভদিনে শুভক্ষণে, শুভ মিলন-মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই তরুণ হিয়ার মধুর মিলন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। মিলন-জ্যৈষ্ঠের পর মধুমাস আসিয়াছে। নব বসন্ত যেন শুধু এই প্রেমিক নবদম্পতিকেই অভিবাদন জানাইবার অভিলাষে, ঘটা ও আয়োজন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার পর আর দুইটি মাস কাটিলেই আর এক জ্যৈষ্ঠ আসিয়া শুভ মিলনের এক বৎসর পূর্ণ হইবে।

মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসে, ঝরণার কি একটা অসুখ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলে ঝরণা সকলকে বলিত—অম্বল, অজীর্ণ, বায়ু, হেন-তেন ইত্যাদি। কুঙ্কুম কাহাকেও কিছুই বলিত না, মুখ সিঁট্‌কাইয়াই থাকিত। মিসেস্ ঘোষাল সদাসর্ব্বদাই যাতায়াত ও দেখাশুনা করিতেন। কুঙ্কুম বড় একটা তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিত না। অবশেষে অগ্রহায়ণের শেষের

দিকে জামাতার ভাব-গতিকে অসন্তুষ্ট হইয়া মিসেস্ ঘোষাল নিজেই ঝরণাকে কোথায় এক স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া গেলেন ও তথাকার জলবায়ুর গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যে কন্যাকে রোগমুক্ত করাইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কুঙ্কুমের মনটা এই সূত্রে মোটেই ভাল নয়। কি যে তাহার হইয়াছে, বলা কঠিন। গল্প লেখা ছাড়িয়া দিয়াছে; বিয়ের পর যে সব কবিতার বই, ঝরণার সহিত পছন্দ করিয়া কিনিয়াছিল, সেসব পোড়াইয়া ফেলিয়াছে ; বাড়ীতে প্রায়ই থাকে না ; যতটুকু থাকে, ঝরণার সহিত খিটি-মিটি লাগে। কেন তাহার এরূপ হইল ? অন্য কোন তরুণীর প্রতি আকর্ষণ ?—না, তাহা ত নহে। শরীর খারাপ ? তাহাও নয়; শরীর বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভাল বলিয়াই বোধ হয়। অর্থাভাব ? —মোটেই নয়। তবে ?

যাহাই হউক, কোথাও কিসে যেন একটা খুব গরমিল ঘটিয়া গিয়াছে। অতি নব্য তরুণ-তরুণীর মিলনে তাই অশান্তির ছায়াপাত হইয়াছে।

সে দিন বৈকালে হঠাৎ নেড়া মামা আসিয়া হাজির। এরূপ মধ্যে মধ্যে তিনি আসিয়া থাকেন। ঝরণা

বাড়ী ছিল না। কোথায় এক মেয়েদের সভায় সভানেত্রী হইয়া বক্তৃতা দিতে গিয়াছিল। কুঙ্কুমকে মামা জিজ্ঞাসা করিলেন—দাদাবাবু, জোড়-ভাঙ্গা হয়ে যে? দিদিবাবু কই?

মুখখানা বিকৃত করিয়া কুঙ্কুম কহিল—জানি না।

দিদিমণির ওপর এরি মধ্যে এত চটলে চলবে কেন? দুর্লভ দিদিমণি আমার; লেখায়, পড়ায়, গানে, বাজনায়, কবিতায়, বক্তৃতায়, চালে চলনে—

বেলা ন'টার সময় ঘুম থেকে উঠে, চা খেয়ে সেই বেরিয়েছেন, সন্ধ্যা হ'তে চললো, এখনো বিবি সাহেবের বাড়ী আসা হ'ল না। হয়ত আজ আর আসবেনই না। উঃ, কি ভুল যে ক'রে ফেলেছি।

সে কি কথা ভায়া! তুমিও নব্য এবং তিনিও নব্যা, তোমাদের নব্যতন্ত্রে, এ আর ভুল কাজ কি হয়েছে?

বিষম ভুল—বিষম ভুল ক'রে ফেলেছি, নেড়া মামা।

সত্যি কথা বলতে গেলে, ভুল একটু করেই ফেলেছ কুঙ্কুম। অতটা অপ-টু-ডেট বৌ ঘরে না এনে, একটু যদি কম অপ-টু ডেট দেখে আনতে, তা হ'লে আর অশান্তিটা ভোগ করতে হ'ত না। সত্যি বলছি, কুঙ্কুম,

আমাকে নেহাৎ সেকেলে ব'লে অগ্রাহ্য ক'রো না। আমিও খুব অপ্-টু-ডেট। তোমাদের চেয়েও আমার মনের ভেতরটা কাঁচা আর একেলে। কিন্তু তবুও, আজকালকার এই ধরণের মেয়ে আর তার সঙ্গে আধখানা রাজত্ব পেলেও, আমি তাকে বিয়ে ক'রে ঘরে আন্‌তে পার্‌তুম না। ভাল মেয়েরও অভাব নেই। সত্যিকারের শিক্ষিত অথচ ভাল মেয়ে খুঁজলে এখনো অনেক পাওয়া যায়। ভায়া, জাপানী-ফানুষের ঝক্-ঝকে রঙে যদি না ভুল্‌তে ত আজ এই আপশোষটুকু আর কর্‌তে হ'ত না। তা, এক কাজ কর না কেন। তুমি স্বামী, সে স্ত্রী। অশান্তির কারণ হয়, স্পষ্ট ব'লে কয়ে, বিদেয় ক'রে দাও।

যতটা সোজা ভাবছেন, ততটা নয়। যেমন ইনি, তেমনি এঁর মা। বিদেয় কর্‌লেও যাবেন না কি, মনে ভেবেছেন? কোর্টে খোরপোষের দাবী দিয়ে নালিস করবে, নেড়া মামা।

তা করলেই বা।

সে একটা ঢি ঢি প'ড়ে যাবে। চারিদিকে আমাদের বড় বড় আত্মীয়-স্বজন—বুঝতে পাচ্ছেন না। বাপ-ঠাকুর্দ্দার দৌলতে আমাদের বংশের একটা উঁচু নাম-

সম্ভ্রম রয়েছে,—সেই জন্যেই ত কিছু একটা করতে পাচ্ছি নে, নইলে—

অতঃপর আরও দু'এক কথার পর নেড়া মামা চলিয়া গেলেন। কুঙ্কুম মুক্ত জানালা দিয়া অপরাহ্নের আকাশের দিকে তাকাইয়া, আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবিতে লাগিল।

সেই দিন গভীর রাত্রিতে কি একটা শব্দে কুঙ্কুমের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে এবং সদ্য-আগত ঝরণা, অপরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া কৌচের উপর বসিয়া সিগারেটের ধূমপান করিতেছে। বাহিরের সাজ-পোষাক এখনো তাহার ছাড়িবার অবসর হয় নাই।

কুঙ্কুম পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে, অসম্ভব ধীর এবং শান্তগলায় কহিল—"রাত্রেই ফিরলে?"

একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া ঝরণা কহিল—"হ্যাঁ।"

হি হি করিয়া একটুখানি হাসিয়া কুঙ্কুম কহিল—"ভাল।"

তাহার পর কেহই আর কোন কথা কহিল না।

ইহারই দিন পাঁচ সাত পরে, উপরের ঘরে কুঙ্কুম শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। আজ দুই দিন হইতে তাহার জ্বর। ঝরণা চা খাইয়াই বাহির হইয়া গিয়াছে,

তাহার খান দুই শাড়ী ও আর আর কি সব জিনিষ কিনিবার জন্য। কুঙ্কুম একটু জলের জন্য দুই একবার চাকরকে ডাকিয়া সাড়া না পাওয়াতে, শেষবারে ভীষণ চীৎকার করিয়া এক ডাক দিল। সঙ্গে-সঙ্গেই সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রুত হইল এবং নেড়া মামা আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"কি হে, কেমন আছ? গলা অত চড়া কেন?"

ভৃত্যও আসিয়াছিল। তাহাকে জল আনিতে বলিয়া কুঙ্কুম কহিল—কি মুস্কিলেই যে পড়িছি, মামা! এ ছাড়েও না, যায়ও না। এর হাত থেকে কি ক'রে যে উদ্ধার পাই, তাই ভাবছি!

আমরা হ'লে সহজেই উদ্ধার পেতুম, তোমার দ্বারা তা আর হবে না। এর বিধি হচ্ছে সোজা-সুজি 'হাফ-মুন', অর্থাৎ কি না—অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয়; তোমার দ্বারা ত' তা আর হবে না। কারণ, তুমি তা পার্‌বে না, যেহেতু দিদিমণির ঝক্-ঝকায় তুমি ডুবে, তলিয়ে গিয়েছ। আর তা ছাড়া, সেদিন যা বল্‌লে—লোক-লজ্জার ভয়েও তুমি ততদূর কিছু ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না, আমি বুঝতে পার্‌ছি।—হ্যাঁ হে দাদামণি, ঐ বক্‌সিং গ্লোবস্ জোড়া কার হে?

আপনার দিদিমণির।

নেড়া মামা বিষম বিস্ময়ে সেইখানকার মেজের উপর ঝরণার উদ্দেশে মাথা ঠেকাইয়া তিনবার প্রণাম করিলেন। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ঝর্ণার ড্রেসিং আয়নার ধারে গিয়া তত্রপরিস্থিত স্নো, ক্রীম, লিপষ্টিক প্রভৃতি প্রসাধনের দ্রব্যগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

হ্যাঁ হে, সিঁদুর-ফিঁদুরের হাঙ্গামা বুঝি নেই? আল্‌তা?

কুঙ্কুম চুপ করিয়া রহিল। টেবলের উপরের একখানা খোলা চিঠি তুলিয়া লইয়া নেড়া মামা একবার চোখ বুলাইয়া লইলেন—

মাই ডিয়ার মিসেস্ রায়,

আস্‌ছে রোববার আমি ত্রিশবিঘের জঙ্গলে শীকারে যাচ্ছি; সঙ্গে আপনাকে পেলে পরে খুব খুসী হব। আশা করি অমত হবে না।

আপনার

পি. কে. লাহিড়ী।

কুঙ্কুম হঠাৎ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল—“আচ্ছা নেড়া মামা, খৃশ্চান হ'লে হয় না?”

কারণ ?

খৃশ্চান হয়েছি দেখে, যদি স'রে যায়।

মাথা খারাপ কোরো না, দাদামণি। অসুখ হয়েছে, চুপটি ক'রে শুয়ে থাক।—ভাল কথা, ঐ পি. কে. লাহিড়ীটি কে হে ? তা হ'লে, রবিবার দিদিবাবু আমার শিকারে যাচ্ছেন না কি ?

কুঙ্কুম আবার শুইয়া পড়িল ; কোন উত্তর দিল না।

নেড়া মামা কহিলেন—তোমার এই তিন কাঠার বাড়ীতে, যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, ত্রিশবিঘের ভেতর থেকে তাকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে ?

কুঙ্কুম নীরবে শুইয়াই রহিল। নেড়া মামা একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে টানিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ অংশ

—মিলনের দুঃখ—

পরের রবিবার, সারাদিন ধরিয়া ত্রিশবিঘার জঙ্গল-মধ্যে—পি. কে. লাহিড়ীর সহিত শিকারে মাতিয়া, ঝরণা যখন গৃহে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে বিলাতী ছবিগুলার সঙ্গে যে দুই একখানা হিন্দু দেবদেবীর ছবি ছিল, তাহা খুলিয়া ফেলা হইয়াছে, দুই একখানা নূতন ফ্রেম ঝোলান হইয়াছে—তাহাতে বাইবেল হইতে বাক্য উদ্ধৃত। একখানাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—My God Shall Supply All Your Needs.

ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখে যেখানে ঝরণার বড় এন্‌লার্জ্জমেণ্টখানা টাঙানো ছিল, সেই ফ্রেমেতে ক্রসবিদ্ধ যীশুর প্রকাণ্ড ছবিখানা শোভা পাইতেছে। টেবলের উপর হইতে ঝরণার ডাইরী বইখানা কোথায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে—একখানি সুদৃশ্য, মরোক্কোয় বাঁধানো স্বর্ণাঙ্কিত বাইবেল।

কুঙ্কুম ঘরের মধ্যেই ছিল।

ঝরণা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ সব কি ব্যাপার ?

ব্যাপার কিছুই নয় ; আমি খৃশ্চান হয়েছি।

কুঙ্কুম আশা করিয়াছিল যে, তাহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত দেখিলেই ঝরণা তাহার গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

হইলও তাই। ব্যাপার দেখিয়া পরদিনই ঝরণা তাহার মায়ের নিকট চলিয়া গেল।

মা পরামর্শ দিলেন,—"তুমি কাপড়-চোপড় গহনা পত্র নিয়ে চ'লে এস। আমাদের ধর্ম্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম্মে কিছুতেই যাওয়া হবে না। টাকা-পয়সা ? যাদের কুঙ্কুম নেই, তারা কি টাকা-পয়সার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে ?"

সুতরাং সেই দিনই ঝরণা তাহার কাপড়-চোপড় ইত্যাদি লইয়া এ বাড়ী চলিয়া আসিল।

কুঙ্কুমের দিন এক রকম শান্তিতেই কাটিতে লাগিল। সে নিত্য প্রভাতে ক্রাইষ্টের নাম লইয়া শয্যাত্যাগ করে, খায়-দায়, বেড়ায়, বায়স্কোপ দেখে আর মধ্যে মধ্যে শয়ন-গৃহস্থিত যীশুর প্রকাণ্ড ছবিখানির নীচে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, 'প্রভু' বলিয়া প্রার্থনা সুরু করে এবং 'আমেন' বলিয়া শেষ করে।

প্রায় মাসখানেক পরে এক দিন সকালে এইরূপ যীশুর ছবিখানির নীচে জানু পাতিয়া বসিয়া যখন প্রার্থনা করিতেছিল,—'হে স্বর্গীয় পিতা, তুমি পাপীর প্রতি সর্ব্বাগ্রে তোমার মঙ্গলহস্ত প্রসারিত কর', সুতরাং—' ঠিক সেই সময়ে নিকটে কাহার পদশব্দ পাইল। তত্রাচ সে চক্ষু না চাহিয়াই তাহার প্রার্থনা শেষ করিল —'সুতরাং আমার অন্ধকার দুর্দ্দিনে আমাকে, হে দয়াল প্রভু, তোমার প্রেমের হস্ত দান করিও।' তৎপরে চক্ষু চাহিতেই দেখিল যে, ঠিক তাহারই পার্শ্বে সমভাবে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া—ঝরণা। তাহার বুকের ক্রুচের সঙ্গে স্বর্ণ-নির্ম্মিত একটি ক্রুস ঝুলিতেছে, চক্ষু মুদিত অবস্থায় মনে মনে যাহা সে এতক্ষণ বলিতেছিল, এবং সেই প্রার্থনাটি শেষ করিয়া হঠাৎ সে—'আমেন্' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুঙ্কুম সবিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন—"এ কি?"

কিছুই না। কাল আমিও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছি।

উঃ! বলিয়া কুঙ্কুম মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

* * * * *

দিন পাঁচ সাত তালে-গোলে কাটিয়া গেল।

জোসেফ অর্থাৎ কুঙ্কুম দেখিল, ক্যাথারাইন অর্থাৎ ঝরণা ছাড়িবার পাত্রী নহে, তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। সুতরাং সে মহা-চিন্তিত হইয়া উঠিল। এমনই সময় এক দিন নেড়ামামা ঈষৎ টলিতে টলিতে আসিয়া বক্তৃতার সুরে সুরু করিলেন—তোমার স্বর্গীয় পিতা যেন তোমার পাপ ক্ষমা করিয়া তোমায় আলোক-দান করেন। ভাই রে, তাড়াতাড়ি কাজটা ক'রে বসলে, সেকেলে লোকের একবার পরামর্শটাও নিলে না। ঝরণার মত কলেজে-পড়া শিক্ষিতা মেয়েকে যখন বিয়ে করেছ, তখন অনেক দুঃখ তোমার বরাতে আছে, জানতে পারছি।

জোসেফ কহিল—শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করিছি, সেইটেই কি আমার দোষ হয়েছে, নেড়ামামা? আপনি কি বলতে চান, সে-যুগের মত কুসংস্কারে-ভরা আর অশিক্ষিতা মেয়ে—

আরে রাম—রাম, আমি তা বলছি না। মেয়েদের শিক্ষা আর সংস্কারে অন্ধ ক'রে রাখলে এ জাত আর ক'দিন টিঁকবে। মেয়েদের শিক্ষা না দিলে আর উপায় নেই। কিন্তু আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েরা কি

সাংঘাতিক হাওয়া সৃষ্টি করছে, তা এখন ভাল করেই বুঝতে পারছ বোধ হয়। দোষ—মেয়েদের নয়, দোষ মেয়েদের বাপ-মাদের, দোষ স্কুল-কলেজের কর্ত্তাদের। শিক্ষার সুফল কই, নীতি কই, আসল দেশপ্রীতি কই, ভক্তি-শ্রদ্ধা, ভালবাসা কই, সত্যিকারের জ্ঞান কই ?

জোসেফ কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া নেড়ামামা কহিল—ফাঁকির প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করো না। হাড়ে হাড়েত কুফল ভোগ করছ, দাদাভাই। শিক্ষার প্রকৃত পথে চল্লে, মেয়েদের দ্বারাই এ দেশ আবার উঠবে, আর শিক্ষার বিকৃত পথে গেলে, যা হচ্ছে এমনই হবে—জাত আর দেশ রসাতলে যাবে।

উভয়ের মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া বহু কথার আলোচনা ও পরামর্শ হইল।

পথে আসিতে আসিতে নেড়ামামা ভাবিলেন—'যেমন দেবা, তেমনই দেবী। যেমন কুস্কুম, তেমনই কুস্কুমী;—যেমন ঝরণা, তেমনই ঝরণ। এদের আবার ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম। এরা না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান। এদের খৃষ্টান হলেই বা কি আর হিন্দু থাকলেই বা কি, ধর্ম্মের ত এরা ধারও ধারে না। এদের খৃষ্টান হওয়া

শুধু একটা খেয়াল ছাড়া ত আর কিছুই নয়। এ সব হচ্ছে—এদের খেলা। ছিল হিন্দু, হ'ল খৃষ্টান, তার পর হবে হয়ত বৌদ্ধ। আজ যে-ঝরণার জন্যে মন খারাপ,—কাল সেই ঝরণার জন্যে হয় ত পাগল হয়ে যাবে।

—পঞ্চম অংশ—

—মিলনের মধু—

সাত দিনের কথা।

সন্ধ্যাকাল।

কুঙ্কুমের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কৌচের উপর মনোমুগ্ধকর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া ঝরণা কুঙ্কুমের হাত ধরিয়া কহিল—"আমায় পায়ে রাখ তুমি।"

পা ছেড়ে মাথায় ক'রে তোমায় রেখেছিলুম ঝরণা!

পুরাণো কথা সব তোমাকে একেবারে ভুলে যেতে হবে। বল, ভুলে যাবে? আমার মুখের দিকে চেয়ে বল, নইলে তোমায় কিছুতেই আজ আর ছাড়ছি না।

ঝরণা কুঙ্কুমের হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

কুঙ্কুম একদৃষ্টে ঝরণার অপরূপ সৌন্দর্য্য-শ্রীমণ্ডিত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ হইতে কোন কথা আর বাহির হইল না। ক্রমে ঝরণার হাত শিথিল হইয়া আসিল, কুঙ্কুমের নিষ্প্রভ চক্ষু বুজিয়া আসিবার মত হইল। ঝরণার মাথা কুঙ্কুমের বুকের মাঝে হেলিয়া পড়িল।

তাহার ববড্-করা সুবাসিত কেশগুচ্ছগুলি হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে কুঙ্কুম ডাকিল—ঝরণা !

কুম্ —কু !

তুমি আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক, তোমায় ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি ? কোন কষ্ট, কোন অশান্তিকেই আর মনে স্থান দেব না। তুমি যাই হও, তুমি আমারই ত বটে। তোমায় যে আমি স্বয়ম্বর-সভা থেকে, সাত শ' প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাভ করেছি, ঝরণা !

আবেগের ভরে উভয়ের কেহই লক্ষ্য করে নাই যে, নেড়ামামা জানালার ফাঁকে দাঁড়াইয়া ইহারের প্রেমের অভিনয় দেখিতেছিলেন। সেইখানেই দাঁড়াইয়া মামা মনে মনে বলিলেন,—এরা অতি জঘন্য, অতি যাচ্ছেতাই। এদের বরাতে অনেক কিছুই—আছে।—প্রকাশ্যে কহিলেন, "বাঃ বাঃ—অতি সুন্দর। এত রসের ছড়া-ছড়ি, এ দিকেও যেন ছিটে-ফোঁটা কিছু আসে।"

কুঙ্কুম ও ঝরণা চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মামা কহিলেন—আচ্ছা কুঙ্কুম, একটি কথা ঠিক ক'রে বল ত' দাদামণি। সত্যিই কি তুমি খৃশ্চান হয়েছিলে ?

না মামা ; সমস্তই মিথ্যা আর অভিনয়। কিন্তু অভিনয় কেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আর নিখুঁৎ হয়েছিল, তাই একবার বলুন।

আর ঝরণা,—তুমি ?

আমারও অভিনয়।

মামা অবাক হইয়া দু'জনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ অংশ

—উপক্রমণিকার জের—

শ্যামবাজারে মিত্র কোম্পানীর সুবিখ্যাত স্বদেশী 'পাদুকা-শিল্পাগার।' এবার নববর্ষে তাহাদের নব অবদান...এক-প্রকার নূতন গঠনের স্যাণ্ডেল। এই স্যাণ্ডেলের মধ্যস্থলে ক্রেতার ইচ্ছানুযায়ী মনোগ্রাম বা নাম সোনালী অক্ষরে ঝলমল করে—ইহাই ইহার অভিনবত্ব।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ঝরণা ও কুঙ্কুমের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। কাল আবার সেই ১৫ই জ্যৈষ্ঠ। সে দিন ঝরণা কথায় কথায় বলিয়াছিল—১৫ই জ্যৈষ্ঠ তুমি আমাকে কি উপহার দিচ্ছ, কুম্? কুঙ্কুম কহিয়াছিল. "—যা দেবার সব ত দিয়েছি, ঝরণা; আর ত কিছু বাকী নেই।" ঝরণা বলিয়াছিল—"বেশী কিছু নয়, একখানা রেডিও শাড়ী, সেই পীসেরই একটা ব্লাউজ, একজোড়া গিনির উপর মিনে-করা দুল, আর পাদুকা-শিল্পাগারের নাম-লেখা স্যাণ্ডেল একজোড়া। স্যাণ্ডেলের order আমি কাল দিয়েই এসেছি।"

স্যাণ্ডেলে কার নাম লেখা থাকবে ?

তোমার প্রিয়তম—তোমার ; আবার কার ?

আমার বহুজন্মের পুণ্য যে, আমার নাম, যা তোমার পায়ের তলায় রাখবার যোগ্য নয়, তা পায়ের ওপর রাখবে।

তার পর ১০ দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ ১৪ই জ্যৈষ্ঠ। কাল পনরই। আজ ঝরণার রেডিও শাড়ী কিনিতে হইবে, মিনে-করা ঝুমকো, সেণ্ট, সাবান, স্যাণ্ডেল—কত কি কিনিবার রহিয়াছে, কিন্তু যে কিনিয়া দিবে, সে কোথায় ? কুঙ্কুম আজ প্রাতেই কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, সমস্ত দিন সে বাটী ফিরে নাই।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখিয়া ঝরণা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বাহির হইতেও পারিল না, ঘরেও তাহার ভাল লাগিতেছিল না। কুঙ্কুম টাকা দিয়া গেলে সে নিজেই পছন্দমত জিনিষ এতক্ষণ কিনিয়া আনিতে পারিত।

ঝরণা কুঙ্কুমের দেরাজের চাবি খুঁজিয়া দেখিল, পাইল না। অযথা একটু টানাটানি করিল, দেরাজ খুলিল না। তখন পাশের বাড়ী হইতে তাহাদের চাবির গোছা আনাইয়া চেষ্টা করিল, হইল না। আর এক বাড়ীর

চাবির থোলো আনাইল। এবার একটা চাবিতে দেরাজ খুলিয়া গেল। খান দুইচার নোট লইয়া ঝরণা তাহার শাড়ী, ব্লাউজ, ইত্যাদি কিনিতে বাহির হইল। যাহাদের চাবি, তাহাদের ফেরৎ দিয়া পাঠাইল। দেরাজ খোলাই রাখিয়া দিল, আবার যদি দরকার হয়।

মনোমত দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করিয়া ঝরণা যখন গৃহে ফিরিল, তখন রাত প্রায় দশটা। তখনও কুঙ্কুম ফিরিয়া আসে নাই। বাজার করিয়া যে কয় টাকা বাঁচিয়াছিল তাহা দেরাজের মধ্যে তুলিয়া রাখিতে গিয়া, সে তাহার মধ্যে কুঙ্কুমের এটা-সেটা জিনিষ নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ একখানা চিঠি তাহার চোখে পড়িল। চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে তাহার পা অবশ হইয়া আসিল। সে কৌচের উপর বসিয়া তাহা পড়া শেষ করিল।

চিঠিখানি এই :—

প্রিয় কু—

মেঘের আশায় চাতকিনী আর কত দিন থাকবে? মনে থাকে যেন—১৪ই জ্যৈষ্ঠ। তারিখটা—ভুলো না। ইতি

তোমারই শুধু—

দীপালী—

ঝরণার মাথা ঘুরিয়া গেল। আজই ত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ। তাই আজ সারাদিন—। কে এই—'তোমারি শুধু'? দীপালী? আমার সঙ্গে পড়্‌তো, সেই দীপালী দাস নাকি?

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঝরণার চক্ষুতে নিদ্রা আসিল না। শয্যায় শুইয়া সে নানাদিকে নানাভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

পরদিন একটু বেলায় শয্যাত্যাগ করিয়া ঝরণা সাজ-গোজ করিয়া 'পাদুকা-শিল্পাগারে' গেল। কাল রাত্রিতে অত দূর গিয়া স্যাণ্ডেল জোড়াটি সে আনিতে পারে নাই।

স্যাণ্ডেল-জোড়া বাস্তবিকই অতি সুন্দর হইয়াছিল। মনোমুগ্ধকর রঙীন ভেলভেট্ ও ক্রোকোডাইল লেদারে তাহা প্রস্তুত। মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণে বিচিত্র ভঙ্গীতে লেখা —'কুঙ্কুম'।

জুতাটি লইয়া দোকান হইতে ফুটপাথে নামিতেই এক বিষম দৃশ্য ঝরণার চক্ষুতে পড়িল। দ্রুতগামী এক ট্যাক্সিতে বসিয়া কুঙ্কুম, আর তাহার পার্শ্বে—সেই—সেই —সেই বটে। তাহারই সঙ্গে কলেজে পড়িত—সেই দীপালী—দীপালী দাস। দীপালী অপরূপ বেশে

সজ্জিত, মাথাটা তাহার কুঙ্কুমের কাঁধের উপর রক্ষিত, একখানা হাত কুঙ্কুমের কোলের উপর। গাড়ীখানার হুড তোলা থাকিলেও, চক্ষুর নিমেষে এই দৃশ্য ঝরণার নয়নগোচর হইল। এক বছর পূর্ব্বে আজকার এই দিনটি তাহার স্মরণে আসিল। সে-দিনই বা কি আর আজই বা কি? সমস্ত অন্তর তাহার বিষে ভরিয়া উঠিল। সে কাগজে-মোড়া স্যাণ্ডেলের প্যাকেটটা হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখী একখানা 'বাসে' উঠিয়া পড়িল।

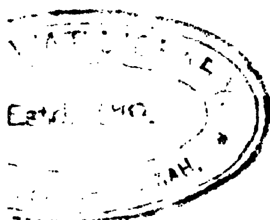
বাড়ী আসিয়া সে তাহার নূতন-কেনা শাড়ী, ব্লাউজ, ব্রুম, সেণ্ট, ফুল প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত হইল। নূতন স্যাণ্ডেলটি পায়ে পরিল। তার পর আলমারী খুলিয়া বক্রী দুইখানা নোট যাহা ছিল, তাহা লইয়া—পি. কে. লাহিড়ীর বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

যখন ফিরিল, তখন রাত প্রায় বারোটা। চোখ দু'টা কিছু উজ্জ্বল, দৃষ্টি আবেগময়, দেহ ক্লান্ত, মনের পরিচয় পাইবার উপায় নাই। সে শাড়ী ছাড়িল না, ব্লাউজ খুলিল না, বুকের ব্রুচ বুকের গাঁথা রহিল, পায়ের স্যাণ্ডেল পায়েই থাকিল। সেই অবস্থাতেই কৌচের উপর শ্রান্তদেহ এলাইয়া দিল এবং অল্পসময়ের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ঘরের মধ্যে সাড়া-শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিল, কুঙ্কুম তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সে চোখ মেলিয়া চাহিতেই কুঙ্কুম কহিল—"তোমার হয়েছে কি? এই ভাবেই এখানে প'ড়ে ঘুমুচ্ছ?"

তোমারই জন্যে অপেক্ষা কচ্ছিলুম। বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঝরণা সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষিপ্রতার সহিত কুঙ্কুমের দীর্ঘ কেশগুচ্ছ বাঁ হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া, ডান হাতে তাহার সেই নূতন স্যাণ্ডেল পা হইতে খুলিয়া লইয়া তদ্দারা সজোরে কুঙ্কুমের সর্ব্বাঙ্গে—চটাপট শব্দে আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল।

ঠিক সেই মধুর ক্ষণে ছাদের দিক হইতে যেন একটা দৈববাণী শুনিতে পাওয়া গেল—৩২ বৎসর পূর্ব্বকার দুঃখের আজ তোমার শোধ উঠলো, উমারাণী। বলা বাহুল্য, আমার যে ভুলের জন্য তোমার সেদিনের সেই দুঃখের সৃষ্টি হয়েছিল, বর্ত্তমান হট্টমালার যুগে আমার সে ভ্রম সংশোধন ক'রে নিয়েছি। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হট্টমালা যুগের এই আদর্শ দম্পতি তখন ছাদের কড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।



সেকালের নিমন্ত্রণ

—[চিত্র]—

আষাঢ় মাসের শেষ ভাগ। আকাশে বৃষ্টি নাই, মেঘ নাই, মেঘবৃষ্টির আশাও নাই। অপরাহ্ণে বারান্দায় একখানা আরাম-কেদারায় বসিয়া বসিয়া নানা বিষয়ের খাপছাড়া ভাবনা ভাবিতেছিলাম। কন্যা শেফালী আসিয়া পাশে দাঁড়াইল, কহিল—"বাবা, শরৎবাবুদের বাড়ী নেমন্তন্ন। যাবে না ?"

যেতেই হবে একবার ; তবে সেখানে কিছু খাব না, ঘরে যেন আমার খাবার তৈরি থাকে।

বন্ধু-পুত্রের বিবাহে বৌভাত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ। হাজার হউক, 'ফলারের বামুন' ত বটে, সুতরাং ফলারের নামে এবং গন্ধে মনটা নাচিয়া ওঠে। তবে এই পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে মন যদি বা নাচিয়া ওঠে, উদর কিন্তু সে নাচনে তেমন যোগ দেয় না। তাই ইদানীং বাধ্য হইয়া কোন

কোন স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হয় বটে, কিন্তু আহারের লোভটাকে একটু কষ্ট করিয়া সম্বরণ করিতে হয়,—নইলে বিপদ ঘটে।

এক-দিন বন্ধু-গৃহে গেলে, বন্ধু কহিলেন—"কিছু না খান ত এইখানে চেয়ারে বসে এঁদের খাওয়া দেখুন। ঘ্রাণে যে অর্দ্ধ-ভোজন হবে, তা'তে আর কোন অসুখ করবে না।"

যেখানে আহারের স্থান হইয়াছিল, তাহারই এক ধারে আমার জন্য একখানি চেয়ার পাতিয়া দেওয়া হইল।

দেখিলাম, বর্ত্তমান যুগে নানা বিষয়ে যেরূপ অভূত-পূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে, নিমন্ত্রণ এবং আহারাদি ব্যাপারেও তাহা বাদ পড়ে নাই।

ভোজন-স্থানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত খোঁটা পুঁতিয়া তদুপরি কাঠের তক্তা বিছাইয়া টেবিলের মত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তক্তাগুলি 'টয়লেট পেপারের' মত এক প্রকার পাতলা সাদা কাগজে মোড়া। তাহার উপর মাটির থালা। এইরূপ পাঁচ-সাত সারি তক্তা-টেবিল এবং তাহার কোলে ছোট ছোট চেয়ারের সারি।

প্রথম দলকে আহারের জন্য ডাক দিতেই হু-হু করিয়া বন্যার ঘোলা জল-স্রোতের মত নিমন্ত্রিত বাবুর দল আসিয়া শূন্য চেয়ারগুলি দখল করিয়া বসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আমার পরিচিত। কতক সুপরিচিত এবং অতি অল্প-সংখ্যক মাত্র অপরিচিত। বন্যার স্রোতোবেগ একটু স্থির হইলে দেখিলাম, নরেন চাটুজ্যের পার্শ্বে বসিয়াছে কার্ত্তিক ঘোষের ভাইপো, এবং তাহার পার্শ্বে বসিয়াছে—কালী কাঁসারীর এক পুত্র। কালী কাঁসারী বর্ত্তমানে পাঁচ-সত খানা বাড়ী এবং নগদ বিশ-ত্রিশ হাজারের মালিক। সুতরাং কালী কাঁসারীর এই পুত্রটিকে পাড়ার সকলেই শ্রদ্ধা-ভক্তি করে ও ভালবাসে। তাহার পার্শ্বে বসিয়া রায় সাহেব অন্নদা বাঁড়ুয্যের ভাগনেটি খাইতে খাইতে কি-একটা খুব মজার গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল আর সেই গল্প একান্ত মনে উপভোগ করিতেছিল—সামনের সারির যদু বোস, রতন গাঙ্গুলী, সন্তোষ গুঁই, নিতাই বাবু আর প্রফুল্ল মুকুয্যে। নিতাই বাবু অর্থাৎ নিতাইচরণ দাস। ইনি বর্ত্তমানে দশ-বারো খানি ট্যাক্সির মালিক, কোন্ এক ফিল্ম কোম্পানীরও না কি সিকি অংশীদার। ইঁহারা জাতিতে রজক হইলেও ইঁহার

ঠাকুরদাদার পর আর কেহ জাতি-ব্যবসা করেন নাই।

লুচি, শাক ভাজা, পটল ভাজা এবং আলু-কুমড়ার ছক্কার পর যখন পোলাও এবং মাছের কালিয়া আসিয়া হাজির হইয়াছে, তখন কর্ম্ম-কর্ত্তা আমার বন্ধুটি, একটি ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া তথায় হাজির করিলেন এবং ভোজনরত বাবুদের উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—একখানা পাতা এখানে হবে না? একে বেহালায় যেতে হবে—দিন থাক্‌তে থাক্‌তে।

প্রফুল্ল মুকুয্যে ছক্কার ছোলা চিবাইতে চিবাইতে বলিয়া উঠিল—হবে'খন, হবেখ'ন। সতোন গুঁইয়ের পাশে অতটা জায়গা রয়েচে, ঐখানে একখানা চেয়ার পাড়বে এখন। তারপর নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—তবে মশাই, aircarটা একটু শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সেরে নিতে হবে। কেন না আমরা অর্দ্ধেক পথ ছাড়িয়েচি।

সতোন গুঁইয়ের পাশে বসিবার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি যেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কর্ম্ম-কর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—'ব্রাহ্মণেরা সব বসেচেন কোথায়?' এখানে ত দেখ্‌চি—এই কথায় নরেন

চাটুয্যে মাছের মুড়া চিবাইতে চিবাইতে ইসারায় ডাক দিল—হরিপদ!

হরিপদ পোলাওয়ের বাদাম বাছিতে বাছিতে ডাকিল —বলি, ওহে যদু! যদু হাঁকিল—সত্যেন! সত্যেনের মুখ হইতে বাহির হইল—নিতাই বাবু! অর্থাৎ, ইঁহাদের এই হাঁক-ডাকের মানে বোধ হয় এই যে—এই হ-য-ব-র-ল লোকটা কে হে?

যাহা হউক, বিপন্ন ভদ্রলোকটির অবস্থা দেখিয়া আমি আমার বন্ধুকে কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি কহিলাম—এ'কে আলাদা কোন জায়গায় একখানা পাতা ক'রে বসিয়ে দাও, দেখচো না, সেকেলে লোক। বলিয়া নিজের মনে নিজে একটু হাসিলাম।

ইঁহাদের খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ দইয়ের পর সন্দেশের গোলা-গুলি লইয়া যখন ছোঁড়া-ছুঁড়ি চলিয়াছে, তখন আমি ভিতরের দিকে সেই ভদ্রলোকটির আহারের একবার তত্ত্বাবধান করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, এখানকার অধিকাংশ বাবুদেরই আহার, আচমন, হস্তমুখ-প্রক্ষালন ইত্যাদি সর্ব্বকার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা চেয়ারে বসিয়া পাণ চিবাইতেছেন। কেহ কেহ বা পাণ চিবাইতে

চিবাইতে সিগারেট টানিতেছেন। যাঁহাদের একটু বাকী ছিল, তাঁহারা হয়ত বা গেলাসের জলে আঙ্গুল কয়টীর ডগা ডুবাইয়া, তদ্দ্বারা গোঁফ এবং ওষ্ঠদ্বয় সিক্ত করিতেছেন; কেহ বা পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাদের সিক্ত হস্ত-মুখাদি মার্জ্জিত করিতেছেন। চমৎকার!

এই ত আধুনিক উন্নত যুগের ভোজ এবং ভোজনের ব্যাপার! কিন্তু আমার বলিবার বিষয় ইহা নহে। এই সূত্রে সেদিন ভাবিতে গিয়া সেকালের নিমন্ত্রণের কথা যাহা আমার মনে উদয় হইয়াছিল, সেই কথাটাই আজ বলি!

সেকাল অর্থে—বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ আগেকার কথা। তখন আমাদের বয়স দশ-বারো বৎসর হইবে, অর্থাৎ নিমন্ত্রণ খাইতে বেশ এক রকম পটু হইয়াছি।

সারদা বাঁড়ুয্যের বাড়ী নিমন্ত্রণ। কিসের উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, ঠিক স্মরণ নাই। তবে বোধ হয়—সেও বৌ-ভাত; কেন না, বাটী হইতে ঠাকুরমার আদেশে, প্রথমে গিয়াই তাহাদের বৌ দেখিতে হইয়াছিল এবং বৌয়ের হাতে একটি টাকা দিতে হইয়াছিল। তবে খাইবার সময় ভাতের সঙ্গে কোন সংস্রব ছিল না, তাহাও বেশ

মনে আছে। খাইয়াছিলাম—লুচি, ছোলার দাল, কুমড়ার ঘ্যাঁট, মাছের একটা তরকারী, আমড়ার টক আর শেষের দিকে 'চঞ্চল' দই, অর্থাৎ যে দই পাতের এক স্থানে কদাচ স্থির হইয়া থাকে না, এবং তৎপরে বোঁদে এবং আরও তৎপরে আধা-ছানার ছোট ছোট গুলি-সন্দেশ।

এখন যেমন, যে-কোন ব্যাপার উপলক্ষে খাওয়া হউক না কেন, তাহার আয়োজন রাত্রেই করিতে হয়, কারণ, দিনের বেলা গৃহে থাকা প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটে না, তখনকার দিনে কিন্তু বিবাহ ছাড়া সকল কাজ-কর্ম্মে আহারাদির ব্যবস্থা দিনের বেলাতেই হইত। অফিসার বলিতে যাহা বুঝায়, তেমন কোন লোক পাড়ায় বড় একটা ছিল না। আমি আমাদের কালী-ঘাটের কথা বলিতেছি। সমগ্র কালীঘাটের মধ্যে তখন মাত্র তিন-চারি জন লোক অফিসে কার্য্য করিত। আমাদের পাড়ার উমেশ বাঁড়ুয্যের ভাই অবিনাশ বাঁড়ুয্যেই শুধু কোন্ এক অফিসে কেরাণী-গিরি চাকুরী করিত। যাক, নিমন্ত্রণের খাওয়া হইতে দূরে আসিয়া পড়িতেছি।

সারদা বাঁড়ুয্যের বাড়ী নিমন্ত্রণ। ঠাকুমা বলিলেন, —সকাল সকাল দু'জনে দুটি ঝোল-ভাত খেয়ে নে,—

ওদের হোতে-করতে সেই বেলা তিনটে। দু'জন মানে —বিনুদা আর আমি। আমরা দু'জনে নিমন্ত্রণে যাইব এবং এজন্য হপ্তাখানেক আগে হইতে দিন গণিয়া আসিতেছি। কিন্তু ঠাকুরমার আদেশ আমরা অগ্রাহ্য করিলাম। সকলে যখন খাইল,—তখন আমরা আর দুটি ঝোল-ভাত খাইলাম না, কারণ আজ পেট ভরিয়া লুচি খাইতে হইবে, কাজেই ঝোল-ভাতে আগে হইতে পেটটাকে ভরাইলাম না।

ওদিকে ক্ষুধায় পেট চুঁই চাঁই করিতেছে। বেলা একটা বাজিতে চলিল, তবুও কর্ম্মবাড়ী হইতে কেহ আর ডাকিতে আসে না। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। সেকালে শুধু নিমন্ত্রণ করিয়াই কর্ম্মকর্ত্তার কর্ত্তব্য শেষ হইত না। রান্না-বান্নার আয়োজন শেষ হইলে পর, প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের বাটী লোক পাঠাইয়া তাহাদের ডাকিয়া আনা হইত।

বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে অথচ কেহ ডাকিতে আসিতেছে না, মনটা বিরক্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

খানিক পরে ও-পাড়ার কালী-কাকা একখানা পাট-করা গামছা মাথায় দিয়া হন্ হন্ করিয়া সদর ঠেলিয়া বাড়ী ঢুকিয়া হাঁকিলেন,—"কই গো সব, চল চল, আর

দেরী কোরো না—কে যাবে? পঞ্চু আর বিনু? দাদা বুঝি যেতে পারবেন না? যাও,—তোমরা যাও,—আমি এ পাড়ার সকলকে একবার ডাক দিয়ে যাই।”

বউয়ের হাতে দিবার জন্য ঠাকুরমা একটা টাকা আমার হাতে দিলেন। লোকের বাড়ী বিবাহ পৈতা উপলক্ষে এই টাকা দেওয়ার প্রথাটা তখনকার দিনে খুবই চল ছিল; এখন আর এ-সব বালাই নাই। এখন প্রত্যেক নিমন্ত্রণ-পত্রের নীচে বিশেষ করিয়া লেখা থাকে—‘লৌকিকতার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়।’ কথাটি খুবই বিনয়-পরিপূর্ণ। তখন কিন্তু লৌকিকতাও বজায় রাখা হইত এবং আশীর্ব্বাদও যে না করা হইত, এমন নহে। আমার মনে হয় লৌকিকতার প্রথাটি ভালই ছিল। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার মূলে Insurance-এর নীতি বর্ত্তমান ছিল। অর্থাৎ পঞ্চাশ ঘর গৃহস্থকে তাঁহাদের ঘরের বিবাহ পৈতা প্রভৃতি উপলক্ষে আমি ধুতি, শাড়ী, টাকা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া রাখিলাম। এই দেওয়াটা আমার মোটেই গায়ে লাগিত না, কারণ, মাঝে মাঝে—ক্ষেপে ক্ষেপে—কিছু কিছু করিয়া অনেক দিনে ইহা আমি দিয়া আসিয়াছি। তাহার পর, যখন আমার

বাড়ীতে ঐরূপ কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম হইল, তখন সেই একদিনে অনেকের কাছ হইতে আমি নগদ টাকা, কাপড় ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাইলাম। ঐগুলি আমার বাড়ীর সেই কাজে লাগিয়া গেল এবং ইহাতে আমার বহু পরিমাণে অর্থের সাশ্রয় হইল। মোটের উপর, বহুদিন ধরিয়া অল্প অল্প যোগান দিয়া দরকারের সময় একসঙ্গে অনেক পাইলাম। Insurance-এর মূল নীতিও এই। সুতরাং লৌকিকতার প্রথাটি যে মন্দ ছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমরা হিন্দু, সমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সুখে সুখী—দুঃখে দুঃখী হইয়া, এক বৃহৎ পরিবারের মত বাস করাই আমাদের জীবন-যাত্রার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা লৌকিকতা-প্রথার সৃষ্টি করিয়া ভুল ত করেন নাই—অধিকন্তু ইহাতে তাঁহারা সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

যথাসময়ে কর্ম্মবাড়ী পৌঁছাইয়া দেখিলাম, এ-পাড়ার ও-পাড়ার, সে-পাড়ার অনেকেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। সকলকে ছাপাইয়া আমার দৃষ্টি গিয়া পড়িল —বুড়া নীলমণি চাটুয্যের উপর। নীলমণি চাটুয্যে পাড়া-সম্পর্কে আমার ঠাকুরদা হইতেন। তাঁহার মত রসিক আর 'গল্পী' লোক আর ছিল না বলিলেই হয়।

আমার সঙ্গেই তাঁহার প্রণয়টা যেন অন্য সবার অপেক্ষা একটু বেশী ছিল। সুতরাং তাঁহাকে বরাবর আমি এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতাম। আমি যাইতেই নীলমণিদা বলিয়া উঠিলেন—'আরে এস—এস, পঞ্চু এস, বিনু এস।' বলিয়াই তিনি অঙ্গভঙ্গী সহকারে গাহিয়া উঠিলেন—

"ওরে যাদের তরে নদে পাগল—
তারা দু'ভাই—এসেচে রে।"

তারপর সমাগত সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—দেখ, আমি পঞ্চুর কে হই, বোধ হয় অনেকেই তা জানো না?—শোনো।

আমি ওর বোনাই হই, উনি হন শালা,
ওর বোনাকে বিয়ে করে আমার এই জ্বালা।

কেমন রে পঞ্চু, ঠিক কি না।

আমার ত আর সেখানে থাকা হইল না। আমি বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর অন্দরের দিকে পলাইয়া নীলমণিদার হাত হইতে রক্ষা পাইলাম।

অন্দরের বিস্তৃত অঙ্গনেই আহারের স্থান হইয়াছিল। প্রকাণ্ড উঠান। বর্ষায় তাহাতে ঘাস জন্মিয়াছিল। কোদাল দিয়া সেই ঘাস চাঁচিয়া সমগ্র উঠানটি পরিষ্কার

করা হইয়াছে। তাহার পর গোবর-গোলা দিয়া তাহা নিকানো হইয়াছে। উপরে বিস্তৃত পাল খাটানো। একাংশে খানিকটা স্থান হোগলা দিয়া ঘেরা; তথায় মাছের রান্নার ব্যাপার। সে ব্যাপারের ভার ননীর মা'র উপর। পাড়ায় যাহার বাটীতে যে কার্য্য হউক, আমিষ রান্নার কাজটা—ননীর মা'র ছিল একচেটিয়া। আর নিরামিষ রাঁধিত কেষ্টর পিসী, পদ্ম-দিদি, সুরোর দিদিমা—আর ন্যায়লংকার-গিন্নী। ন্যায়লংকার কথাটা ন্যায়লঙ্কারের অপভ্রংশ। বড় কাজ-কর্ম্মে ইহাঁরা চারিজনে এবং অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যাপারে, ইহাঁদের মধ্যে কেহ-না-কেহ কার্য্য-ভার গ্রহণ এবং সম্পাদন করিতেন। লুচি হইলে লুচি এবং ভাত হইলে ভাতটা কেবল বেটা-ছেলেদের রাঁধিয়ার চার্জ্জে থাকিত।

উঠানে সারি সারি কুশাসন আর কলাপাতা পাতা হইতেছিল। খিড়কীর দুয়ারের ধারে তিনটি কুকুর আড্ডা পাতিয়া শুইয়াছিল। বিবাহের দুই-চারি দিন আগে হইতে আর আজ পর্য্যন্ত এই আট-দশ দিন ধরিয়া কুকুর তিনটী সারাদিন ধরিয়া পরিতোষ সহকারে বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর এঁটো-কাঁটার প্রসাদ লাভ করিয়া আসিতেছে। খিড়কীর বাহিরে সজিনা ও আমড়া

গাছের ডালে কয়েকটি কাক গভীর সহিষ্ণুতার সহিত বসিয়া আছে বটে, কিন্তু কুকুর তিনটির তাড়নায় তাহারা বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। সত্যর মা আর হরিদাসী ঝি—দুইজনে কোমড়ে কাপড় জড়াইয়া খুব খাটিতেছে। হরিদাসী একটু চড়া গলায় সত্যর মা'র উদ্দেশে কহিল—"হ্যাঁ লা, সোতুর মা, বামুনরা সব খেতে আসচে, কুকুর কটাকে দূর করে দিয়ে খিড়কীটা বন্ধ করে দে না। এটাও তোকে বলে দিতে হবে!" সত্যর মা হরিদাসীর এই গিন্নী-পনা সহ্য করিতে পারিল না। সে কতকগুলা এঁটো বাসন মাজিয়া আনিতেছিল, ফোঁস করিয়া জবাব দিল, "দিতে পারিস না এসে তুই! সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে কি কাজটা কচ্ছিস?—শুধু ত মুড়ুলী। বলি তোর হাতে কি পক্ষাঘাত—।" ঝগড়াটা কিন্তু পাকিয়া উঠিতে পারিল না, ব্রাহ্মণরা সব আসিয়া পড়িল। হরিদাসী মুড়া ঝাঁটা গাছটা হাতে লইয়া আগাইয়া আসিল। অবশ্য সত্যর মা'র উদ্দেশে নয়—ও-দিক্‌কার রকের নীচেটায় ঝাঁট দিতে। কয়জন অন্য জাত আছে, তাহাদের পাতা হইবে। কে একজন বলিল—"ব্রাহ্মণদের হয়ে গেলে, তারপর ত ওদের সব পাতা হবে। এখন ওখানে ঝাঁট দিতে তোকে কে বল্‌লে?"

পাতায় পাতায় লুচি পড়িতে আরম্ভ হইল। সে লুচিতে আর আজকালকার লুচিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আজকালকার লুচি দেখিতে যেমন সভ্য-ভব্য, তেমনি তাহার স-লজ্জ-প্রকৃতি ; অর্থাৎ হাত দিয়া স্পর্শ করিতে না করিতেই ভাঙ্গিয়া চুর! তখনকার দিনের লুচি দেখিতে যেমন অসভ্য-অভব্য, আকৃতিও তাহার তেমনি বৃহৎ ছিল। অন্ততঃ প্রত্যেক লুচির 'ডায়মিটার' ৮" ইঞ্চির কম হইত না। তাহা ছাড়া সে লুচির প্রকৃতি ছিল ভীষণ। সে লুচিকে কায়দা করিতে বত্রিশটী সবল দন্তকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। এক দিকে দাঁত ও অপর দিকে হাত এবং মধ্যে লুচি। দাঁত ও হাত লুচি ধরিয়া যতই টানাটানি করে, লুচি পরাভব না মানিয়া ততই রবারের মত বাড়িয়া যায়। কিন্তু তবুও আজকাল-কার লুচি খাইয়া সকলের অসুখ করে, অম্বল হয়। তখনকার দিনের সেই বে-আদব লুচি কিন্তু সকলের বে-মালুম হজম হইয়া যাইত ; অম্বল-টম্বলের ধার বড় একটা কেহ ধারিত না।

সবে দুই চারিখানা পাতায় লুচি পড়িয়াছে, ওদিকে রোয়াকের উপর এক বিষম কাণ্ড। হলা ও জলার মধ্যে মারামারি হইবার উপক্রম। হলা চোখ-মুখ রাঙা করিয়া

ঘুসি পাকাইয়া গর্জ্জন করিতেছে, আর জলা জলের বাঁক-গাছটা উঁচাইয়া হলার মাথা ফাটাইতে উদ্যত। হলধর আর জলধর দুজন জলের ভারি। ইহারা উড়িয়া দেশবাসী। তখন কালীঘাট অঞ্চলে 'কলের জল' হয় নাই। প্রত্যেক বাড়ীতেই পানের জন্য গঙ্গাজল ব্যবহার হইত। হলধর ও জলধর এ পাড়ায় গঙ্গাজল জোগাইত। রোয়াকের উপর সারি সারি চারিটি জালাতে দু'জনে জল ভরিতেছিল। তারপর কি লইয়া উভয়ের মধ্যে প্রথমটা রাগা-রাগি পরে বকা-বকি, লাফা-লাফি এবং মারামারির উদ্যোগ। উভয়ে উভয়কে মারিতে উদ্যত। বিষম কাণ্ড! তুমুল ব্যাপার! ব্রাহ্মণ-ভোজন বুঝি বা পণ্ড হয়! তখন নীলমণিদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উভয়কে শান্ত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে, কতকটা শান্তির ভাব দেখা দিল,। নীলমণিদা তখন একটি শোলোক আওড়াইয়া কহিলেন—এটির মানে তোদের দু'জনকে বলতে হবে :—

হলধর কউচি—জলধরকে
—'চক্রধারীকে কে মারিলো?'
না—'স্বর্গে ছিল পঞ্চ-পাণ্ডব
মারি কিরি বনে গেলো।'

এইটির মানে তোদের দু'জনের মধ্যে যে বলতে

পারবে, সে তিন গণ্ডা লুচি আর আড়াই গণ্ডা মোণ্ডা পাবে।

কিন্তু, হলা আর জলার কানে নীলমণিদার প্রশ্ন প্রবেশ করিল কি না বলা যায় না। তাহারা তখনো ফোঁস ফোঁসানী ছাড়ে নাই। সুতরাং চক্রধারীকে কে মারিলো—তাহা লইয়া কেহ আর মাথা ঘামাইল না। ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে দু'জনেই বাঁক ঘাড়ে করিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে যাঁহারা খাইতে বসিয়াছিলেন, নীলমণিদার শোলোক তাঁহাদের মধ্যে একটা হাস্য এবং হেঁয়ালির সৃষ্টি করিল। বিজয় ভট্টাচার্য্য কহিলেন—"তোমার শোলোকের অর্থটা ভেঙ্গে দাও, নীলু। আমরা ত কিছুই বুঝলুম না।

নীলমণিদা কহিলেন—"বুঝলে না ?"

হলধর কউচি—জলধরকে
—'চক্রধারীকে কে মারিলো ?'
না—'স্বর্গে ছিল পঞ্চ-পাণ্ডব,
মারি কিরি বনে গেলো।'

বাবা, তোমরা সব এত লেখাপড়া শিখেছ, এইটের মানে

আর বলতে পারলে না কেউ! আমার বিদ্যে ত গিরীশ পণ্ডিতের পাঠশালার আঙ্ক আস্ক পর্য্যন্ত। এর মানে হচ্ছে ঃ—

পথের ধারে জলধর দাঁড়িয়ে রয়েছে; হলধর এসে দেখল যে একটা সাপ মরে পড়ে রয়েচে। সে জলধরকে জিজ্ঞাসা করলে—চক্রধারীকে অর্থাৎ সাপটাকে মারলে কে? জলধর জবাব দিলে—গাছ থেকে ওর মাথায় একটা 'চালতা' পড়ে ও মারা গিয়েছে, আর চালতাটা গড়িয়ে বনের ভেতর চলে গেছে।

দেবেন হালদার কহিল—নীলুর এত রকম সঞ্চয়ও আছে! এ সব পাও কোথায় তুমি? বলিতে বলিতে তিনি পাতের লুচি কয়খানা পিছনের গামছায় বাঁধিয়া ফেলিলেন। শুধু দেবেন হালদারই নয়, প্রায় সকলেরই পিছনে একখানা করিয়া গামছা কিম্বা চাদর বর্ত্তমান এবং প্রথম ক্ষেপ লুচিগুলি পাতে পড়িবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ওই গামছা বা চাদরের মধ্যে ক্ষিপ্রতার সহিত স্থানান্তরিত। পরিবেষণকারীর দিতে যা দেরী; সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলির অন্তর্ধান—আবার পূর্ব্বের মত শূন্য পাত। সেই শূন্য পাতে এবার কুমড়ার ছক্কা আসিয়া পড়িল। পাতা তখন এঁটো হইয়া গেল, সুতরাং এঁটো পাতা হইতে আর ছাঁদা তোলা চলিবে না। তখন লুচি

পরিবেষণকারী প্রত্যেকের পাতে 'দ্বিতীয় সংস্করণ' লুচি দিতে সুরু করিলেন।

সাতকড়ি গাঙ্গুলী তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সাতখানা পাতা দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনখানা গামছা ফেলা ছিল, আর বাকী চারখানার একখানায় তিনি স্বয়ং, একখানায় হাবলী, একখানায় জটা আর একখানায় খেঁদী। জটা আর হাবলী একটু বড় হইয়াছে। এক-জনের বয়স বছর চার আর একজনের বছর সাত কি আট। কিন্তু খেঁদীর বয়স বছর তুইয়ের বোধ হয় বেশী হয় নাই। তাহার সব দাঁতক'টাও এখনো ওঠে নাই। খালি ছাঁদার জন্যই তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনা এবং পাতা দখল করিয়া বসা। কিন্তু তবুও সে সশরীরী। অ-শরীরী তিনটি প্রাণী যে কে, তাহাই চিন্তা করিবার বিষয়। কিন্তু বেশীক্ষণ এ বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে হইল না। দ্বিতীয় ক্ষেপ লুচি দিতে আসিয়া, পরিবেষণ-কারী ভোলা-কাকা যখন জিজ্ঞাসা করিল—এ পাতা তিনখানা গাঙ্গুলী মশাই? সাতকড়ি গাঙ্গুলী তখন একনিশ্বাসে বলিয়া গেলেন—একখানা মেনীর, একখানা গেনীর, একখানা রামুর।

ইহারা সকলেই তাঁহার পুত্রকন্যা।

পুনরায় প্রশ্ন হইল—তারা কোথায়?

তারা বাড়ীতে। তাদের কি আর আসবার যো আছে? একটার হোয়েচে খোস, একটার হোয়েচে জ্বর, একটার—

ওদিক্ হইতে কর্ম্মকর্ত্তা অর্থাৎ সারদা বাঁড়ুয্যে অকুস্থানে আসিয়া হাজির হইলেন এবং হস্তেঙ্গিতের দ্বারা কহিলেন—"দিয়ে যাও, ভোলানাথ সাতখানা পাতার ছাঁদা ও গাঙ্গুলী মশায়ের বাঁধা।" সুতরাং পুনরায় দ্বিতীয়বার সাতখানা পাতায় চারিখানা হিসাবে লুচি দিয়া ভোলা-কাকা চলিয়া গেল এবং সাতকড়ি গাঙ্গুলী ২৮খানা লুচির মধ্যে ২৩খানা পুনরায় ছাঁদা বাঁধিয়া ফেলিলেন। বাকী পাঁচখানার আড়াইখানা রাখিলেন নিজের পাতে, একখানা জুটুর পাতে, একখানা হাবলীর পাতে, আর অর্দ্ধখানি খেঁদীর পাতে। এ লুচিগুলি একখানা আলাদা গামছায় বাঁধা হইল, কারণ এগুলি এঁটো পাতের লুচি। নীলমণিদা খাইতে খাইতে বলিয়া উঠিলেন—"গাঙ্গুলী মশাই, এঁটো পাতও তা'হলে স্বর্গে যায়?" গাঙ্গুলী মশাই তখন সেই ৮ ইঞ্চি ব্যাসের আধখানা লুচি ছক্কার সঙ্গে মিলাইয়া মুখে পূরিয়াছেন,

সুতরাং কথাটার উত্তর আর দিতে সমর্থ হইলেন না, কিম্বা ইচ্ছা ছিল—হি-হি করিয়া একটু হাসিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দেন, তাহাও পারিয়া উঠিলেন না। আড়াই মিনিটের মধ্যে তিনি আড়াইখানা লুচি উদরস্থ করিয়া ভোলা-কাকাকে আবার লুচির জন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ আমি দেখিতে পাই নাই যে নগেন রায় আমাদের সঙ্গে খাইতে বসিয়াছেন। তিনি ওদিককার সারির সর্ব্বশেষ আসনখানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নগেন রায় একজন পাকা নিমন্ত্রণ-খাইয়ে। কালীঘাটে তাঁর মাতুলাশ্রম। জন্ম এখানে না হইলেও, এইখানেই তাঁহার বাল্যকাল হইতে কাটিয়াছে। তাঁর দেশ ছিল, হাওড়া জেলার কোথায় বসন্তপুর নামে গ্রাম আছে—সেইখানে। যখন পাতে পাতে দই এবং বোঁদে পড়িল, তখন সারদা বাঁড়ুয্যে স্বয়ং তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আজ ত কিছুই খাচ্ছ না নগু।

শরীরটা আজ ভাল নেই, মামা।

গণ্ডা কতক লুচি আর এনে দিক।

না মামা, লুচি আর মুখে ভাল লাগছে না।

বোধ হয় তাহাই হইবে, কারণ গণ্ডা আষ্টেকের বেশী আজ তিনি খাইতে পারেন নাই। শরীর ভাল থাকিলে, আট গণ্ডা তাঁহার পক্ষে 'অর্দ্ধমাত্রা'।

যাহা হউক, দইয়ের একখানা পূরা হাঁড়িই তাঁহাকে দেওয়া হইল। এইরূপই নিয়ম। সেরখানেক আন্দাজ বোঁদেও পাতে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অর্দ্ধেকটা দই নগেন রায় চুমুক দিয়া খাইয়া ফেলিল; বাকী অর্দ্ধেকটা বোঁদের সংযোগে উদরস্থ হইয়া গেল।

নীলমণিদা উঁচু হইয়া বসিয়া নগেন রায়ের উদ্দেশে কহিলেন—"আজ তুমি নাম ডোবালে, নগেন।

খেতে বসেছে নগেন রায়,
যে দেখবি সে ছুটে আয়।

তা আজ তোমার এ হচ্ছে কি?"

সত্যিই আজ শরীরটা বড্ড খারাপ। না এলে সারদা মামা দুঃখু করবেন, তাই।

সন্দেশ আসিল।

ছোট ছোট গুলি-সন্দেশ। প্রত্যেকের পাতে চারি গণ্ডা করিয়া এবং হাতে অর্থাৎ ছাঁদার জন্য চারি গণ্ডা হিসাবে দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, সাতকড়ি গাঙ্গুলি পাতের সন্দেশগুলিও ছাঁদা বাঁধিয়া ফেলিলেন!

খেঁদীর বাসনা ছিল—একটা উদরস্থ করে। সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া চাপা কান্না কাঁদিতে সুরু করিল। গাঙ্গুলী তাহাকে একটা ধমক দিয়া ও-দিকে ফিরিয়া ডাকিলেন—কালীচরণ, বাবাজী—খেঁদীটার পাতে দু'টো ফেলে দিয়ে যা ত বাবা। ভারি পাজী মেয়ে! ওদের দু'জনের পাতেও দু'টো করে দিয়ে যাও তবে। বলিয়া হাবলী আর জটার পাতা দু'খানা দেখাইয়া দিলেন। কালীকাকা তাঁহার পাতেও গণ্ডা কতক দিয়া গেল।

কালীকাকা প্রায় এক ধামা সন্দেশ আনিয়াছিল। সকলকে পরিবেষণ করিতে তাহার বারো আনা রকম উঠিয়া গিয়াছিল। বাকী চার আনা রকম সন্দেশ-শুদ্ধ সেই ধামা নগেন রায়ের সম্মুখে আনা হইল। সারদা বাঁড়ুয্যে বলিলেন—নগু, সন্দেশ ক'টা আস্তে আস্তে বসে বসে খেয়ে ফেল, সের দুইয়ের বেশী বোধ হয়-হবে না।

না মামা, আজ আর খেতে পারচি না, গণ্ডা কতক পাতে দিন, আর একটু দই আনিয়ে দিন।

বাস্তবিকই নগেন রায় সেদিন বেশী কিছু খাইতে পারিল না। আধ হাঁড়িটাক দই আবার আসিল। তাহাতে বড় জোর পোয়া পাঁচেক সন্দেশ চট্‌কাইয়া

লইয়া, তাহাই মাত্র উদরস্থ করিয়া সেদিনের খাওয়া নগেন রায় শেষ করিল।

পরে জানা গেল, পূর্ব্ব রাত্রে নগেন রায়ের ১০০°১ ডিগ্রী জ্বর হইয়াছিল।

নগেন রায়ের আহার শেষ হইলে সকলে আচমন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। খিড়কীর পুকুর-ঘাটে আঁচাইবার জন্য ভীড় জমিয়া গেল। কুকুর তিনটি দাঁড়াইয়া ক্রমশঃ লেজ নাড়িতেছিল—ইচ্ছা, কতক্ষণে এঁটো পাতাগুলি আসিয়া খিড়কীর ওঁচলা-গাদায় জমা হয়। কাকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারা যেন একটু অস্থির হইয়া চতুর্দ্দিকে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া দৃষ্টিপাত করিতেছিল। উঠানের এঁটো সাফ করা লইয়া সত্যর মা আর হরিদাসীর মধ্যে আবার এক দফা কথা কাটা-কাটি লাগিয়া গিয়াছিল।

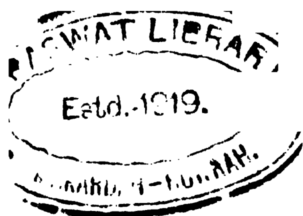
নীলমণিদা 'খড়্কে' দিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে আসিয়া ছড়া আওড়াইলেন :—

হরি বল—হরি বল মন
বাঁড়ুয্যে-বাড়ীর ভোজ হোল সমাপন।

খিড়কীর ঘাটে হাতমুখ ধুইয়া সকলে সদর-বাটীতে আসিলাম। সেখানে তখন ভোজনার্থী একজন ভিখারী

একজন ভিখারিণী গান গাহিয়া ভীড় জমাইয়া ফেলিয়াছিল। ভিখারীর হাতে ছিল খঞ্জনী আর ভিখারিণীর হাতে ছিল এক জোড়া মন্দিরা। তাহারা বিপুল পুলকে ও উৎসাহে তখন গাহিতেছিল—

কানাই, কি অভাবে গৌর হলি, তাই
আমারে বল্।
(ওরে) গোকুল আছে আঁধার হোয়ে—
বিন্দাবনে চল্—রে কানাই,
বিন্দাবনে চল্॥



বিজয়িনী

১

বোষ্টমপাড়ার বিহারী বোষ্টমের বিধবা স্ত্রী রাসমণি বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় তাহার চারি বৎসর বয়স্কা কোলের মেয়েটিকে কোলে করিয়া বাহির হইতে আগড় ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। কালী কুকুরটা উঠানের এক ধারে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল, আগড় খোলার শব্দ পাইয়া সে গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল।

রাসমণি খেঁদীকে দাওয়ার উপর বসাইয়া দিয়া কহিল—চুপটি ক'রে ব'সে থাক্, আমি বেলপাতা নিয়ে আসি। বেলপাতার রস গরম ক'রে একটু খাইয়ে দেব এখন, তাইতেই ও একটু জ্বর আর সর্দ্দি সেরে যাবে তোর। মুখপোড়া ডাক্তারের কাছে আমার আর যেতে ইচ্ছে করে না।

—গৌর গেল কোথা ? ওরে, অ-গৌর !—

আজ এক বৎসর হইতে চলিল বিহারী মারা গিয়াছে। তাই সন্তান দুটিকে লইয়া বিধবার কষ্টের আর সীমা নাই। বিহারী থাকিতেই যে ইহাদের কষ্ট কম ছিল, তাহা নহে, তবে কোন রকমে দুটি শাক-ভাতের তখন যোগাড় হইয়া যাইত। সকালবেলা সে খঞ্জনী হাতে লইয়া দুই একখানা গাঁ গান গাহিয়া আসিলেই দুই চারি আনা নগদ পয়সা ও দুই সের আড়াই সের চাউল তাহার ঝোলায় পড়িত। এখন তাহা বন্ধ হইয়াছে। ছেলে গৌরচরণের বয়স সবে আট বৎসর মাত্র। সে বাপের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ভিক্ষায় বাহির হইত বটে, কিন্তু একলা গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া আনিবার মত শিক্ষা এবং সাহস এখনও তাহার হয় নাই।

কয় দিন হইল খেঁদীর সর্দ্দি হইয়াছে। রাত্রিতে একটু গা গরমও হয়। সামনে পূজা আসিতেছে। পূজার কয়টা দিন পাছে মেয়েটা জ্বরে বিছানায় পড়িয়া থাকে, তাই আজ সকালে বাসিপাট সারিয়া রাসমণি একটা শিশি হাতে লইয়া ওপাড়ায় দাশু মিত্তির ডাক্তারের বাটীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল।

দাশু ডাক্তার বরাবরই রাসমণিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে

দেখিয়া আসিতেছে। বিহারী জীবিত থাকিতে তাহার এই দৃষ্টি-প্রখরতা তেমন ছিল না, কিন্তু বিহারীর মৃত্যুর পর হইতে পথে-ঘাটে রাসমণির দেখা পাইলেই, দাশু ডাক্তারের দৃষ্টি ও বাক্যের মধ্য দিয়া রসের ফোয়ারা ছুটিয়া যাইত।

দিন আষ্টেক আগেও এক দিন দাশু ডাক্তার দোকানের পথে রাসমণিকে একলা পাইয়া চোখমুখের ভঙ্গী করিয়া বলিয়াছিল—ফটিকজল ফটিকজল ক'রে চাতকের প্রাণ যায়, রাসি দয়া কি হবে না? রাসমণি উত্তর দিবার সাহস ও সুযোগ পায় নাই, কিন্তু মনে মনে ডাক্তারের চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ করিয়াছিল।

আজ শিশি হাতে করিয়া খেঁদীর জন্য একটু ঔষধ আনিতে বাহির হইয়া, রাসমণি অর্দ্ধপথ হইতেই ফিরিয়া আসিল। দাশু ডাক্তারের বাটীর যত নিকটবর্ত্তী সে হইতে লাগিল, ততই ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে এই লোকটার কথা ভাবিতে ভাবিতে পথের এক স্থানে হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িল ও সেইখান হইতেই ফিরিয়া খালি শিশি হাতে করিয়া গৃহে আসিল এবং খেঁদীকে দাওয়ার উপর

বসাইয়া দিয়া কহিল—মুখপোড়ার কাছে আমার আর যেতে ইচ্ছে করে না।

গৌর কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—ওষুধ আন্‌লে না মা?

রাসমণি কহিল—বেলপাতার রস ক'রে একটু খাইয়ে দিলেই হবে'খন,—ওষুধ আর লাগবে না। খঞ্জনী-জোড়া নিয়ে তুই বাবা গাঁয়ের তু'পাঁচ বাড়ী একবার ঘুরে আয় দিকি!

আমি রোজ রোজ ভিক্ষেয় যেতে পারব না মা, গানের আমার স্থর হয় না।

যা বাবা, ঘরে একমুঠো চাল নেই। তুমি ঐ কুলীন-পাড়াটি ঘুরে এস, তা হলেই তু'চার পালি হবে'খন। পয়সা তু'একটা যদি পাও ত ফেরবার সময় আধলার নুণ আর আধলার ঝাল-মশলা নিয়ে এস।

তথাপি গৌর বারকতক অনিচ্ছা প্রকাশ করিল এবং রাসমণির পীড়াপীড়িতে অবশেষে পিতৃ-পরিত্যক্ত খঞ্জনী-জোড়া হাতে করিয়া কাঁধে ঝোলা ঝুলাইয়া, ভিক্ষায় বহির্গত হইল।

অনেক চেষ্টা করিয়াও সে বাপের মত ঠিক স্থর করিয়া গাহিতে পারে না। গানের মাঝে মাঝে যে স্থর

খারাপ হইয়া যায়, গান ঠিকমত হয় না, তাহা সে বুঝিতে পারে। তাই পথে বাহির হইয়া সে গুন্ গুন্ করিয়া নিজের মনে মহলা দিতে লাগিল :—

শ্যাম না কি গৌর হয়ে এসেছে রে এই নদীয়ায়।
খুঁজে খুঁজে ফিরি তারে, বল্ গো আমার কালো কোথায় ?

বোষ্টমপাড়ার জোল পার হইয়া নদীর ধারে আসিতেই পিছন হইতে কে গৌরের চোখ টিপিয়া ধরিল। গৌর বলিয়া উঠিল—ভজা। কিন্তু হইল না। ভজা নয়। গৌর বলিয়া গেল—সুরো।—নন্দা—টেঁপা—মোনা—কেষ্টা—যোশো—

যশোদা চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া কহিল—উত্তরপাড়ার ঠাকুর দেখেছিস গৌর, পেরকাণ্ড সিংহি রে ভাই! যাবি দেখতে ?

তখন উভয় বন্ধুতে প্রকাণ্ড সিংহ দেখিবার পরামর্শ হইয়া গেল এবং কুলীনপাড়ার পথের পরিবর্ত্তে উভয়ে নদীর ধারে ধারে উত্তরপাড়ার দিকে অগ্রসর হইল।

উত্তরপাড়ার বারোয়ারীর দুর্গাপ্রতিমায় তখন রং চড়ান হইতেছিল এবং পাড়ার ছেলেমেয়ের দল ঠাকুরকে ঘিরিয়া নানারূপ সঠিক এবং বেঠিক প্রশ্নে পটুয়াদের উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল। যশোদা ও গৌর যখন

ইহাদের এক পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলের মুখে একটা নূতন উৎসাহের ভাব দেখা দিল, এবং ঠাকুর দেখা ছাড়িয়া দিয়া তখন সকলে মিলিয়া ঠাকুর-পুকুরের পদ্ম তুলিতে অভিযান করিল। অধর ঘোষের ছোট মেয়ে কাত্যায়নীর ইচ্ছা হইতেছিল, একবার গৌরের খঞ্জনী-জোড়া লইয়া বাজায়, কেন না, হালে সে তাহার ঠাকুরমার কাছে একটা গান শিখিয়া ফেলিয়াছে—'তোরা দেখবি যদি আয়। আমায় নিয়ে বরটি আমার পাল্কী চেপে যায়।' কিন্তু পাল্কী-চাপার আনন্দ সত্ত্বেও গৌরের নিকট হইতে খঞ্জনী চাহিতে তাহার ভরসায় কুলাইতেছিল না, তাই খঞ্জনীটার উপর শুধু বার দুই হাত বুলাইয়া লইল। পালেদের পাঁচু গৌরের ঝোলাটার ভিতর হাত পূরিয়া দিয়া কহিল,—কিছুই পাস নি, আমি হ'লে এই এ—ত বলিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে দুই হস্ত পশ্চাতের দিকে প্রসারিত করিতে গিয়া ভূপতিত হইতে হইতে সাম্‌লাইয়া লইল।

ঠাকুরপুকুরের পদ্ম তুলিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া পাড়ের উপরকার জামতলায় 'বৌ-বস্তি' খেলিয়া, ঝরণা বিলে জেলেদের মাছ ধরা দেখিয়া, বেলা প্রায় দুপুরের সময় গৌর যখন গৃহে ফিরিল, তখন রাসমণি শুষ্‌নীশাকের

চচ্চড়ি ও ভাত রাঁধিয়া তাহার অপেক্ষায় দাওয়ার একধারে চ্যাটাই পাতিয়া খেঁদীকে লইয়া শুইয়াছিল।

ভাত খাইতে খাইতে গৌর কহিল,—চাল পেলি কোথা, মা?

রাসমণি কহিল—সে খবরে আর দরকার কি? তুই ত শুধু-ঝুলি নিয়ে ঘরে এলি, বাবা!

তুমি আজ রাত্রিতে শুয়ে-শুয়ে ঐ গানটার সুর ঠিক ক'রে শিখিয়ে দেবে, মা?

কোন্ গানটার?

শ্যাম না কি গৌর হয়ে—। দেবে মা? হেই মা, তোমার পায়ে পড়ি, দিও, মা। তা হ'লে অনেক ভিক্ষে আন্‌তে পারব। ঐটে সকলে শুনতে চায়, মা।

রাত্রিতে রাসমণি একপাশে খেঁদীকে আর একপাশে গৌরকে লইয়া শুইয়া গৌরের অনবরত তাগাদায় গুন্ গুন্ করিয়া 'শ্যাম না কি গৌর হয়ে' গাহিতে লাগিল। খেঁদীর আজ জ্বরটুকু হয় নাই, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অন্ধকারে গৌর মায়ের দিকে ফিরিয়া কহিল, মা, কি মা?

না, কিছু না!

তবে ও-রকম ক'রে যে নিশ্বেস ফেললি!—কেন মা?

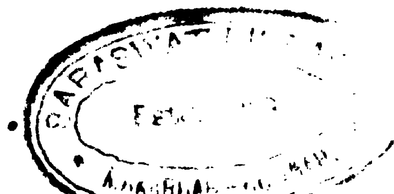
ওরে, গৌরচন্দ্রের জন্যে পাগল হয়ে, এই গান গাইতে গাইতে নদের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন রে!

কে মা?

অবধূত গোঁসাই, নিত্যানন্দ, বাবা! আবার রাসমণি একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

গৌর ইহার ভিতরের তথ্য কিছুই বুঝিল না। মনে ভাবিল, বড় দুঃখ-কষ্টের কথা বোধ হয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে তাহারও মন বেদনায় ভরিয়া উঠিল এবং আর কোন প্রশ্ন না করিয়া রাসমণির বুকের উপর হাত রাখিয়া নীরবে মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল :—

শ্যাম না কি গৌর হয়ে এসেছে রে এই নদীয়ায়।
খুঁজে খুঁজে ফিরি তারে, বল গো আমার কালো কোথায়?



২

সপ্তমীর প্রভাত।

সকালে উঠিয়া রাসমণি গৌরকে ডাকাডাকি করিয়া কোথাও তাহার সাড়া পাইল না। খেঁদীর জ্বর একবারেই সারিয়া গিয়াছিল: রাসমণি তাহাকে কহিল —যা ত মা, পুকুর-গাবাটা একবার দেখে আয় ত, বোধ হয়, ছিপ্ নিয়ে মাছ ধরতে বসেছে।

বছরকার দিনে, সমস্ত উঠান, ঘর-দুয়ার, রান্নার চালা ইত্যাদি গোলা দিয়া নিকাইতে বেলা একপ্রহর উৎরাইয়া গেল। খেঁদী দাদাকে পুকুর-গাবায় দেখিতে না পাইয়া মনসা-তলায় এবং সেখান হইতে হাড়িদের আমড়াতলা হইতে আমড়া কুড়াইয়া উঠানের পিয়ারাতলায় তাহার খেলার হাঁড়ি-কুঁড়ি লইয়া রান্না করিতে বসিল। খোলাম-কুচির মাছ ভাজা, বালিতে জল মিশাইয়া হালুয়া, রাং-চিত্রের ডালনা, পেয়ারাপাতার চড়-চড়ি, আমড়া দিয়া তুলসী-মঞ্জরীর অম্বল, আরও কত কি!

খেঁদীকে রান্নার কাজে নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া, বাসি-

পাট সারিয়া রাসমণি চুবড়ী হাতে করিয়া সোনা-পুকুরে হিঞ্চে তুলিতে চলিয়া গেল।

সোনা-পুকুরে হিঞ্চে তুলিয়া, পাড়ে ডুমুরগাছ হইতে একটি কঞ্চির খোঁচা দিয়া এক রাশ কচি কচি ডুমুর পাড়িল। তার পর বাউরী-পাড়ার পথে চাল্‌তাতলায় আসিয়া গোটা দুই ঝরে-পড়া চাল্‌তা তুলিয়া লইয়া রাসমণি জোলের পথের বাঁক ঘুরিতেই দেখে, দাশু ডাক্তার একবারে সম্মুখে। জড়-সড় হইয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিয়া পথের এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইতেই, দাশু ডাক্তার কহিল—মেঘ না চাইতেই জল! এমনই যদি সব কাজে হয়, রাশু। রাসি রাসি ক'রে প্রাণটা যে আমার গেল, একবার ফিরেও দেখিস না? এই রকম শাক তুলে, ডুমুর পেড়ে, চাল্‌তা কুড়িয়ে—এত কষ্ট করবার কি দরকার বল দেখি।

রাসমণির নিশ্বাস দ্রুত বহিতে লাগিল। আরও খানিকটা তফাতে সরিয়া গিয়া, ঘোমটার ভিতর হইতে সে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল,—পথে ঘাটে এ রকম কথা তুমি আমায় বোলো না, ডাক্তার। ঘরে তোমার বউ আছে, তার সঙ্গে এই রকম কর গিয়ে। রাসমণি হাঁপাইতে হাঁপাইতে পাশ কাটাইয়া, দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল।

ময়রাদের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাশু ডাক্তারের সহিত গৌরের দেখা হইল। দাশু তাহাকে কাছে ডাকিয়া কহিল—কি রে গৌর, ওপাড়ায় পূজো দেখতে গেছলি বুঝি ?

হ্যাঁ।

নতুন কাপড় কে কিনে দিলে ?

মা।

জামা দেয় নি ?

পয়সায় কুলোয় নি। খেঁদীর আর আমার কাপড়েই দেড় টাকা গেছে। গয়লাদের বড়কর্তার কাছে ধার করেছে, ধান ভেনে দিয়ে শোধ করবে। জামা মা দর করেছিল, রক্ষিতরা এগারো আনা দাম বল্লে।

আচ্ছা, জামা আমি তোকে কিনে দিচ্ছি। আয় আমার সঙ্গে রক্ষিতদের দোকানে।

গৌর প্রফুল্লচিত্তে দাশু ডাক্তারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহার পর নিজের একটা ও খেঁদার একটা জামা হাতে করিয়া, হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে গৌর অনেক বেলায় যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন পিয়ারাগাছের ছায়া অনেকটা সরিয়া গিয়াছে, রাসমণির রান্না হইয়া গিয়াছে এবং খেঁদীকে দুটি খাওয়াইয়া ঘুম

পাড়াইয়া গৌরের অপেক্ষায় সে দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া গৌর কহিল—দেখ, কি সুন্দর জামা হল আমার।—এটা খেঁদীর।

জামা! তোরে কে দিলে?

ডাক্তারবাবু। আমি চাই নি, নিজেই ডেকে নিয়ে গিয়ে—

ডাক্তার বাবু? দাসু ডাক্তার? রাসমণির মাথায় যেন নিঃশব্দে একটা বাজ পড়িল। মুহূর্ত্তমধ্যেই সে নিজেকে সচেতন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং উঠানের পুঁইমাচা হইতে একগাছা কঞ্চি টানিয়া লইয়া গৌরের অষ্টাঙ্গে সপাসপ মারিতে আরম্ভ করিল। যন্ত্রণায় লাফাইয়া উঠিয়া গৌর সারা উঠানে ছুটিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কহিল,—আমি চাই নি, নিজে ডাক্তার বাবু———

সপাং—সপাং!—উপরি উপরি আবার কয়েক ঘা মারিয়া রাসমণি হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, এখনই ফেরৎ দিয়ে আয়। আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন। জামা গায়ে দিয়ে যমের বাড়ী যাবি বুঝি মুখপোড়া? যা এইদণ্ডে জামা ফেরৎ দিয়ে আয়।

বলিয়া আবার মারিবার জন্য উদ্যত হইল, গৌর যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে দাওয়া হইতে জামা দুইটি তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাসমণি তাহার পর রান্নাঘরে প্রবেশ করিল এবং গৌরের ভাত আলাদা বাড়িয়া রাখিয়া নিজের ভাতে জল ঢালিয়া রাখিল। তাহার পর সদরের আগড় বন্ধ করিয়া দিয়া খেঁদীর পাশে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

৩

সন্ধ্যার পর শারদীয়া সপ্তমীর চাঁদ অপূর্ব্ব শোভায় আকাশে উদয় হইয়াছিল। তাহার স্নিগ্ধ কিরণ পেয়ারা গাছের ডাল-পাতার ফাঁক দিয়া রাসমণির উঠানে ও দাওয়ার সর্ব্বত্র আসিয়া পড়িয়াছিল। উত্তরপাড়া হইতে ঠাকুরতলার ঢোল-কাঁসির শব্দ, এ পাড়ার অসংখ্য ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের সহিত মিলিয়া যাইতেছিল।

কালীকুকুর আগড় ঠেলিয়া বাড়ী ঢুকিতেই রাসমণি ব্যস্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া চাহিল। আজ সারাদিনই সে দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছে। গৌর সেই মার খাইয়া যে গিয়াছে, এখনও গৃহে ফিরে নাই। তাহার ভাত-তরকারী ঢাকার ভিতর শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। সমস্তদিন একটুখানি জল পর্য্যন্ত মুখে না দিয়া রাসমণি বিকালের দিকে গৌরের খোঁজে সারা গাঁখানা খুঁজিয়া আসিয়াছে,—কোথাও তাহার সন্ধান পায় নাই। কেবল বাগ্‌দীদের নিবারণ বলিয়াছিল যে, বেলা দু'টা তিনটার সময় ঠাকুরতলায় নূতন জামা গায়ে গৌরকে সে যেন একবার দেখিয়াছে।

যত রাত হইতে লাগিল, ছেলের জন্য ভয় ও ভাবনা ততই তাহার বাড়িতে লাগিল। খেঁদীকে একলা ঘরে রাখিয়া এই রাত্রিতে কি করিয়াই বা সে খুঁজিয়া বেড়ায়? বাহিরে দাওয়ায় আরও খানিকক্ষণ শুইয়া থাকিয়া সে খেঁদীকে লইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া শুইল। সদরের আগড় খোলা রহিল। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় তাহার অন্তর মথিত হইতে লাগিল।—বছরকার দিনে কেন বাছাকে আমি অত করে মারতে গেলুম! আট বছরের ছেলে, ও ত কিছুই বোঝে না। হে রাধারাণী, হে ঠাকুর, ছেলেকে আমার ভালোয় ভালোয় ঘরে এনে দাও তোমরা, আর কখনও তার গায়ে আমি হাত তুলতে যাব না।' এক একবার এই ঘটনার মূল দাশু ডাক্তারের উপর ক্রোধে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু গৌরের জন্য দুর্ভাবনায় তাহা স্থায়ী হইতে পারিতেছিল না।

সারা রাত দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্যে কাটাইয়া ভোরবেলা রাসমণি খেঁদীকে ঘরে রাখিয়া গৌরের খোঁজে বাহির হইল। নদীর ধার, শীতলা-তলা, বাবুদের দোলমঞ্চ, ঠাকুরবাড়ী, যশোদাদের চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি সন্ধান করিয়া সে উত্তরপাড়ার ঠাকুরতলায় গিয়া দেখিল, বারোয়ারী তলার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের একাংশে

একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর গৌর ঢুলীদের সঙ্গে ঘুমাইতেছে। তাহার পরনের নূতন জামা-কাপড় সমস্ত রাতের শিশির পড়িয়া ভিজিয়া গিয়াছে। কাছে গিয়া গায়ে হাত দিতেই রাসমণি চম্‌কাইয়া উঠিল। জ্বরে গৌরের গা পুড়িয়া যাইতেছিল। তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেই গৌর আরক্ত চক্ষু একবার চাহিয়া কহিল—মা!

৪

মা

ধন আমার, মাণিক আমার!

আমি কোথায় শুয়ে আছি মা?

ঘরে, বাবা!

গৌর আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। রাসমণি তাহার মাথার ধারে বসিয়া অনবরত পাখার বাতাস করিতে লাগিল আর মনে মনে দেবতার কাছে নিবেদন জানাইতে লাগিল, নারায়ণ, দয়া কর, বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদন, রক্ষা কর। আজ মহাষ্টমীর শুভদিনে আমার বাছার অঙ্গে তোমরা পদ্মহস্ত বুলিয়ে দাও; আমি বড় গরীব, আমার কেউ নেই, হরি!

সন্ধ্যার আগে—গৌর আবার চক্ষু চাহিল। দুই চক্ষুতে যেন রক্ত ঢালা। হঠাৎ খুব ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—মা, মা মা! তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রাসমণি কহিল—এই যে আমি, অমন করছ কেন, বাবা?

আমায় আর মারবি না ত ? দেখ্ মা, এইবার গানটা ঠিক সুর করে গাইতে পারি। দেখবি ? (সুরে)

শ্যাম না কি গৌর হয়ে এসেছে রে
এই নদীয়ায়।
খুঁজে খুঁজে ফিরি তারে, বল গো আমার
কালো কোথায়।

রাসমণির সর্ব্বদেহ অসাড় হইয়া আসিল। কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার যেন লোপ পাইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উঠানের তুলসীতলার কিছু মাটি আনিয়া বিড়্-বিড়্ করিয়া কি বলিতে বলিতে গৌরের সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিল। তাহার পর পাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে ডাকিল—গৌর ?

কোন সাড়া আসিল না।

রাসমণি আবার ডাকিল। উত্তর পাইল না। হাত দিয়া দেখিল, গৌরের গায়ে ধান দিলে খই হইয়া যায়। মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল, যেন দেহের ভিতরকার অগ্নিরাশি ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাসমণি কি যে করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। দাশু ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইবে ?

কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু তা ছাড়া ত আর উপায় নাই। রাসমণি গৌরের মুখের উপর মুখ লইয়া গিয়া আবার ডাকিল—বাবা! গৌরধন!

গৌর অজ্ঞান, অচৈতন্য—বেহুঁস।

দাসু ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইবার জন্য রাসমণি টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; দরজার খিল খুলিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; তাহার পর আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৌরকে গা-নাড়া দিয়া কয়েকবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়াও যখন কোন সাড়া-শব্দ পাইল না, তখন আবার বাহিরে আসিল। একবার আকাশের দিকে চাহিল। একবার অদূরে কুঞ্জ বোষ্টমের ঘরের দিকে দেখিল। তারপর ধীরে ধীরে দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া, সদরের আগড় খুলিয়া কুঞ্জ বোষ্টমের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

৫

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দাশু ডাক্তার তাহার সাঁওতাল ভৃত্যের মাথায় ঔষধের বাক্স চাপাইয়া রাসমণির গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ভৃত্যকে দাওয়ায় বসিতে বলিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া রাসমণির উদ্দেশে কহিল—প্রাণটা তোর কঠিনই বটে, রাসি। আমি থাকতে ছেলেটাকে সমস্ত দিন বিনা ওষুধে রেখে দিয়েছিস্!

রাসমণির মাথার ঘোমটা আজ আর তাহার মুখ ঢাকে নাই। ডাক্তারের কথাগুলি তাহার কাণে প্রবেশ করিল কি না, জানি না, সে দেয়াল ঠেসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—ডাক্তার বাবু, গৌরকে আমার ভাল ক'রে দিন, দয়া করুন, ডাক্তার বাবু!

আমি যখন এসে পড়েছি, তখন আর ভয়টা কিসের রাসু? কত দিন থেকে তোর আশায়—এত দিন কি যে পাগ্‌লামি ক'রে—কোন ভয় করিস নি রাসু, দুদিনের ভেতর তোর ছেলেকে আমি সারিয়ে দেবো। তুই শুধু আমার দিকে ভাল ক'রে একবার চা' দেখি।

রাসমণি শূন্য দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকেই চাহিয়াছিল। গৌরের নাড়ী দেখিতে দেখিতে ডাক্তার দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল, দরজা ভেজানই আছে। রাসমণির দিকে চাহিয়া কহিল,—একবার আয় এইখানে। রাসমণি ডাক্তারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৌরের তোর কোন ভয় নেই। বোস্ এইখানে।

রাসমণি দাস্থর পার্শ্বে বসিল। দরজার দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিয়া দাস্থ অকস্মাৎ রাসমণির গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখখানাকে নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিল।

সঙ্গে সঙ্গেই রাসমণির গাল দুটা যেন বিষে ভরিয়া গেল। সে ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া গিয়া আবার দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

দাস্থ কহিল—ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, কোন ভয়-ভাবনা করিস নি, আবার কাল সকালেই আসবো। বুঝলি ?

ঔষধ দিয়া দাস্থ ভৃত্যের মস্তকে তাহার বাক্স চাপাইয়া চলিয়া গেল। রাসমণি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই একই ভাবে তেমনই করিয়া দেওয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর গৌরের মাথার ধারে আসিয়া বসিল।

পরদিন নবমীর প্রত্যূষেই দাস্থ ডাক্তার গৌরের

সংবাদ লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া রাসমণির বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, কুঞ্জ বোষ্টমের মা দাওয়ার উপর খুঁটী ঠেস দিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে গৌরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে সে উপরের দিকে চোখ ও হাত দিয়া কি ইঙ্গিত করিল। দাস্থ ডাক্তার ধীরপদে দাওয়ায় উঠিয়া মুক্ত দুয়ারের ফাঁকে দেখিল, গৌরের দেহ একখানি চাদর দিয়া আপাদ-মস্তক ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া দাস্থ জিজ্ঞাসা করিল—কখন্ হ'লো দিদি ?

শেষ রাতে।

চেষ্টা করিয়া দাস্থ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

শেষটা কি উপলক্ষ হ'ল ?

উপলক্ষ আর কি ? চোরা বিকার, জ্ঞান-গম্যি ত কিছু ছেল না। বৌমার মুখে শুনলুম, সেই অবস্থাতেই না কি পেরাণটা বেরিয়ে গেছে।

দাস্থ ডাক্তার একবার চারিদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এরা সব কোথায় ?

খেঁদীকে কোলে নিয়ে ঐ খিড়কীতে গিয়ে ব'সে রয়েছে। শক্ত মেয়ে মানুষ বটে! জল-জ্যাস্ত ছেলেটা ম'রে গেল, চোখে এক ফোঁটা জল নেই, একটু ভেঙ্গে

পড়া নেই। আপনি বুঝি কাল রাত্তিরে এয়েছিলে একবার ?

এক পা এক পা করিয়া দাশু ডাক্তার খিড়কীতে আসিয়া দাঁড়াইল। রাসমণি খেঁদীকে কোলে করিয়া আসন-পীড়ি হইয়া বসিয়াছিল। সম্মুখে হাড়িদের আউস-ক্ষেতের দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। দাশুর পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দাশু আবার জোর করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মৃদুস্বরে কহিল—মারে হরি ত রাখে কে! এ কথাও রাসমণির কর্ণে প্রবেশ করিল না। তারপর দাশু ডাক্তার যখন তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সে চমকাইয়া উঠিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—তোমার ওষুধ এক দাগও খেয়ে যায় নি। ঠোঁট গড়িয়ে ক'বারই পড়ে গেল। ওষুধের দামটা কুঞ্জ-ঠাকুরপোকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো এখন। বলিয়া খেঁদীকে বুকে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তথা হইতে ধীরে ধীরে সম্মুখের আউস-ক্ষেতের দিকে চলিয়া গেল।

* * * *

বিজয়াদশমীর অপরাহ্ণ হইতেই ত্রিবেণীর গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য লোকের ভিড় জমিতে সুরু করিয়াছে।

কেহ বিসর্জ্জন দেখিতে আসিয়াছে, কেহ মেলা দেখিতে আসিয়াছে, কেহ বা শুধু জিনিষ-পত্র কিনিতে আসিয়াছে, গঙ্গার উপরে রাস্তার দুই ধারে সারি সারি নানা দ্রব্যের দোকান বসিয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসী, ভিখারী-ফকীরের সংখ্যাও অনেক। গঙ্গায় কেহ স্নান করিতেছে, কেহ স্নান করিয়া উঠিতেছে, কেহ স্নান করিতে নামিতেছে। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই।

খেঁদী মায়ের কোলে থাকিয়া, হাতের বাঁশীটাতে একটা ফুঁ দিয়া কহিল—এবাল কোথায় দাবি, মা? রাসমণি কহিল—এবার গঙ্গাজলে মুখখানাকে একবার ভাল ক'রে ধুয়ে, দুটো ডুব দেবো, মা!

তাল্ পলে ঘলে দাবি?

ঘরে আর যাব না, মা। ভিক্ষে করতে করতে নবদ্বীপ চ'লে যাব। গৌরকে যিনি টেনে নিয়েছেন, তাঁর পায়ের তলাতেই গিয়ে প'ড়ে থাকবো।

পাশের একজন ভিখারী তখন একতারা বাজাইয়া গাহিতেছিল—

আঁধার ঘরে কাঁদিয়ে সবে
সত্যি কি তুই চল্লি উমা!

খেঁদী আর একবার বাঁশীতে ফুঁ দিল,—পোঁ—ও—ও—ও—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে—"

গৌরগোপাল গোস্বামী স-পারিষদ শিষ্যবাড়ী বেড়াইয়া ফিরিতেছিল।

শীতের প্রারম্ভেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শীত কাটাইয়া এখন বসন্তের বাতাস গায়ে লাগাইতে লাগাইতে, দুই মাসের উপার্জ্জিত অর্থ ও বস্ত্রাদির মাধুর্য্য-ভারে বিভোর হইয়া, তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, যেহেতু, সম্মুখেই দোল।

এই দোল উপলক্ষেই তাহার শিষ্যবাড়ী-ভ্রমণ। বহু-কাল হইতেই তাহার গৃহে দোল হয়। বৎসরের মধ্যে ইহাই এক দিকে যেমন তাহার গৃহের উৎসব, অন্য দিকে তেমনই তাহার একটি প্রধান আয়ের পথ। এই দোল উপলক্ষ করিয়াই প্রতি বৎসর গোস্বামী-ঠাকুর তাহার পিতৃপুরুষগণ কর্ত্তৃক হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শিষ্য-

গণের বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনিত, তাহার পরিমাণ চারি পাঁচ শত টাকা হইত। সুজন্মার বছর হইলে আরও বেশী হইত! কিন্তু দোলে গৌরগোপাল ব্যয় করিত সর্ব্বসাকল্যে পাঁচখানি দশটাকার নোট। সুতরাং বাকী টাকাটা তাহার সঞ্চিত টাকার অঙ্ককে বৎসরের পর বৎসর কেবল বাড়াইয়াই আসিতেছিল।

পারিষদরূপে জগন্নাথ গুঁই এবার তাহার সঙ্গী ছিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, তবে হইবার আর বড় দেরীও ছিল না। মস্তকে বস্ত্র ইত্যাদির বিপুল বোঝা লইয়া এবং দক্ষিণ হস্তে বিরাট-বপু সুপুষ্ট ক্যাম্বিসের ব্যাগটি ঝুলাইয়া গোস্বামী ঠাকুরের পিছন পিছন দ্রুত চলিতে চলিতে জগন্নাথ কহিল,—ঠাকুর, একটু বসে দম নিয়ে নিলে হয় না?

গৌরগোপাল কহিল—আর ত এসে পড়েছি এইবার। ওই যে সামনে তালগাছগুলো দেখা যাচ্ছে—ওর পরেই একখানা বড় মাঠ, সেইটে পেরুলেই গোপীনাথপুর আর কি! তার পর চলিবার গতি একটু কমাইয়া দিয়া কহিল,—তা জিরিয়ে নিতে চাস্ ত একটু বসা যাক্। আয় ওই বট্ গাছটার তলায়।

বোঝা নামাইয়া, বটগাছের ছায়ায় বসিয়া, হাত দিয়া

কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে জগন্নাথ বলিল,—শুধুই বসবে ঠাকুর?—একটু—

হাতের গামছাখানি ঘুরাইয়া অঙ্গে বাতাস করিতে করিতে গৌরগোপাল কহিল,—চড়াবি একটু বলছিস? —আচ্ছা, চড়া তবে। বলিয়া ব্যাগ হইতে ছোট্ট একটি ন্যাকড়ার পুঁটুলী, কলিকা, সাঁপি প্রভৃতি বাহির করিয়া জগন্নাথের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল,—অল্প করে নিস, মাল ফুরিয়ে এসেছে। এখানে আবার ও মেলেও না। গোপীনাথপুরে আর দেরী করা নয়। কালকেই এখান থেকে রওনা হয়ে এক্কেবারে বাড়ী। অনেক দিন বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। মনটা বাড়ীর জন্যে ছট্‌ফট্ কচ্ছে। বলিয়া দিক্‌প্রান্তে আকাশের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

জগন্নাথ কহিল,—তোমার ত মাঠাক্‌রোণ ছাড়া ঘরে আর ছেলেপুলের হ্যাঙ্গামা নেই, ঠাকুর। আমার এক-পাল ছেলে-মেয়ে। তাদের নিয়ে মাগী যে কি কচ্ছে! তার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—তোমারও হবার কথা বই কি। ছেলে বল, পিলে বল, ভাই-বোন্ সবই ত হল গিয়ে ঐ মাঠাক্‌রোণ। মন চঞ্চল হয় না আবার! বিয়ে করা ইস্তিরি!

দূর ব্যাটা গাধা কোথাকার! তোর মাঠাকরোণের জন্যেই কি আর আমার মন ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে?

হস্ত-তালুস্থ মর্দ্দিত মালের উপর ফোঁটা কয়েক জল দিয়া ডলিতে ডলিতে জগন্নাথ কহিল,—তবে?

তুই তার কি বুঝবি বল্‌? দু-একটা উপযুক্ত ছেলে-টেলে থাক্‌লে আর ভাবনার কি ছিল? গরীব হই, যা হই, দু-দশ টাকা যা আছে, সে ত আর ব্যাঙ্কে জমা নেই রে,—ঘরেতেই ত আছে। তার পর ১।১খানা সোনা-দানাও আছে, এটা-সেটা আছে। বাড়ীতে পুরুষ বলে ত আর কেউ নেই,—গেরোর ফেরে কখন্‌ কি—বুঝতে পাল্লি না?

তা যা বললে, তা ঠিক, ঠাকুর! গেল বছর তিনটি দিনের জন্যে শ্যামগঞ্জে কুটুমবাড়ী গেছলুম,. ফিরে এসে দেখি, কাস্তে দুখানা, মাল কাটবার ছুরিটা, গোয়ালের ভেতর একটা লাঙ্গলের মুড়ি রেখেছিলুম, এ সব একে-বারে বেমালুম্‌ লোপাট্‌! ধর গিয়ে উপযুক্ত দু-একটা ছেলেও ঘরে রয়েছে, তা এরই মধ্যে থেকেও জিনিষ কটা গেল।—তা দেখছি, ও ছেলে থাকলেও যা, না থাকলেও তা। বেটাদের রশ্বি-দীরঘি জ্ঞান—

অমন কথাটি বলিসনি রে, জগা! বলে, পুতের মূতে

কড়ি। বেশী নয়—একটা ছেলে যদি আমার থাকতো, তা হলে কি আর—। এক একবার মনে হয়, এই প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রে, খেটে-খুটে ধূলো-গুঁড়ো যা একটু ক'রে যাচ্ছি, এ কার জন্যে! বলিয়া মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোবিন্দ বলিয়া জগন্নাথের দিকে ফিরিয়া বসিতেই জগন্নাথ কহিল,—আর একটা বিয়ে কল্লে হয় না, ঠাকুর?

দূর পাগল, ক্ষেপেছিস্? এই ৫২ বছর বয়সে কি আর বিয়ে করা চলে? খানিক নীরব থাকিবার পর গৌরগোপাল আবার কহিতে লাগিল—তবে, এর ভেতর একটা কথা আছে। বয়েস আমার ৫২ হলেও দেহ আর মন যা আছে, তা অমন ২৫।২৬ বছরের ছেলেদেরও নেই। উদ্ধ-শ্লেষ্মা আর বাতিকে যদি মাথার চুল আর দাড়ী-গোঁফ না পাক্‌তো, তা হলে ও—গোবিন্দ—গোবিন্দ—সকলি তোমার ইচ্ছা, দয়াময়!

জগন্নাথ কলিকায় আগুন দিয়া গৌরগোপালের হস্তে দিয়া কহিল,—ও সব কথা এখন থাক, লাগাও দিখি ঠাকুর, এখন জয় বাবা ভোলানাথ! বিশ্বম্ভর-বিশ্বনাথ! শিবশম্ভু-শূলপাণি, মহেশ-ধূর্জ্জটি, পশুপতি-পঞ্চানন—বোম্—বোম্—বোম্!

২

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার কিছু পরেই গৌরগোপাল শিষ্যের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে জগন্নাথ গোয়াল-ঘরে প্রভুর রাত্রির আহারের আয়োজনে উঠিয়া গেল এবং গৌরগোপাল শিষ্যবাড়ীর সকলকে পদ-ধূলি ও আশীর্ব্বাদ দেওয়ার পালা সাঙ্গ করিয়া জপ-আহ্নিকে বসিল। দীর্ঘ দুইটি ঘণ্টার পর আসন হইতে উঠিয়া গৌরগোপাল 'শ্রীগোবিন্দ রাধাগোবিন্দ' বলিতে বলিতে গোয়ালে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের উদ্দেশে কহিল,—কত দূর—জগ? ওরে ব্যাপ রে! এই এত ময়দা মেখে ফেলেছিস্? এত খাবে কে রে?

ময়দার তাল ঠাসিতে ঠাসিতে জগন্নাথ বলিল,—বোল্‌ছো বটে, ঠাকুর, কিন্তু তোমারই এ আঁটবে না, দেখে নিও। এই দু মাস সঙ্গে থেকে দেখে আসছি ত। আচ্ছা ঠাকুর, বাড়ীতে ত এর সিকির সিকিও খাও না। শিষ্যিবাড়ীতে তোমার এত খাওয়ার বহর বাড়ে কি করে? ওই ত ছিটে-বেড়ার দেহ, কি করে ওরই ভেতর এতটা মাল সম্পত্তি কর বল ত?

দরজার ফাঁকে উঠোনের দিকে একবার দেখিয়া লইয়া গৌরগোপাল চাপা গলায় ধমকাইয়া বলিল,—চুপ্ চুপ্, ব্যাটা! কোথায় কি বলে ফেলে দেখ!

যাক্, তরকারীটা তুমি বসিয়ে দাও দিকি। আমি লুচিগুলো বেলে ফেলি।

তরকারীর কড়া উনানে বসাইতে বসাইতে গৌরগোপাল কহিল,—কতগুলো লুচি হবে বল্ দেখি? আমার যে আজ তেমন খিদে নেই রে।"

"আরে খিদে থাকলে ত এতে তোমার একেবারেই কুলোত না। গণ্ডাদশেক লুচি হবে আর কি। খিদে নেই বলেই ত কম করে মাখলুম্। এইতেই দু'জনের হয়ে যাবে এখন।

আহারের সময়, দশ গণ্ডা লুচির মধ্যে অক্ষুধার গৌরগোপাল ছয় গণ্ডা গলাধঃকরণ করিয়া জগন্নাথের সক্ষুধায় খাইবার জন্য চারি গণ্ডা পাতে রাখিয়া উঠিয়া পড়িল।

জগন্নাথ কহিল,—আর দুচারখানা খেলে না কেন ঠাকুর!

আসনের উপর দাঁড়াইয়া গৌরগোপাল বলিল,—কি বলছিস রে জগা, পেটটা একবার দেখেছিস্? শেষকালে

কি বিদেশে একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলব!—ওরে, দুধটা ত খাওয়া হল না।

পাশের প্রকাণ্ড দুধের বাটিটির দিকে চাহিয়া জগন্নাথ কহিল,—খাও নি, ভালই হয়েছে। অ-খিদের ওপর এতগুলো লুচি খেলে, আর দুধটা না হয় নাই খেলে ঠাকুর? যা বল্‌লে—বিদেশ-বিভূঁই।

খাব না তবে?

না—ও আর খেয়ে কাজ নেই।

কতটা হবে বল্ দেখি?

তা প্রায় সেরখানেক হবে। খুব ঘন ক'রে জ্বাল দিয়েছিলুম কি না।

আচমন ক'রে উঠে পড়লুম যে,—নইলে—

ও আর লোভ ক'রো না, ঠাকুর—হাজার হোক বুড়ো বয়েস ত! রক্তের জোর কমে এসেছে। এই খাওয়ার পর আর ঐ অতটা ক্ষীরের মত দুধ নাই খেলে।

আরে, তা ব'লে দুধটা খাব না? ফেলে যাব?

তাই যাও। রাত-বিরেতে শেষে একটা কাণ্ড—

দূর পাগল!

তবে খাও।

কিন্তু আচমন ক'রে উঠে পড়লুম যে!

তা হোক, কে আর দেখছে এখন ?

মুক্ত দুয়ারের ফাঁকে বাহিরের দিকে একবার দেখিয়া গৌরগোপাল পুনরায় আসনের উপর বসিল এবং সেই বৃহৎ বাটির এক বাটি গাঢ় 'ক্ষীরসরাটি' দুধ নিরতিশয় তৃপ্তি ও আনন্দের সহিত পান করিয়া, গোয়াল হইতে বাহির হইয়া বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রিতে গৌরগোপাল ডাকিল—জগা—জগন্নাথ—বাবা!

দুই চার বার ডাকিতেই জগন্নাথ সাড়া দিল। গৌরগোপাল কহিল,—ওরে, পেটটা বড্ড ব্যথা করছে। অক্ষুধার ওপর খেয়েছি, বোধ হয়, কিছু হজম হয়নি, বুঝিছিস ?

জগন্নাথ উঠিয়া বসিয়া কহিল,—সেই জন্যেই ত অত ক'রে বলেছিলুম ঠাকুর যে, ওই অতটা দুধ—

আরে, তাতে কি হয়েছে ? হজম আমি এক দণ্ডেই করিয়ে দেওয়াচ্ছি দেখ না। একটু মাল তৈরী ক'রে ফেল্ দিখি।

জগন্নাথ দাঁড়াইয়া উঠিতেই গৌরগোপালও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—জগ,—শীগ্‌গির—শীগ গির শীগ্‌গির—গাড়—গাড়ু। বলিতে বলিতে গৌরগোপাল

উঠানে নামিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি সদরের খিল খুলিতে খুলিতে কহিল,—তবে রইলো গাড়ু,—এই পেছনের পাঁদাড়ে দিয়ে যাস্।

সে রাত্রিতে পিছনের পাঁদাড়ে গৌরগোপালকে বহুবার ছুটাছুটি করিতে হইল। সুতরাং পরদিন আর তাহার গৃহে আসা হইল না। তবুও অসুস্থ শরীরে প্রাতঃকালে তাহার দুই ঘণ্টা আহ্নিকের কামাই হইল না। শিষ্য মাধব স্বর্ণকার আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে নিবেদন করিল,—এই অসুখ শরীরে এতক্ষণ ধ'রে জপ-আহ্নিক না করে—

গৌরগোপাল কহিল, গোবিন্দ! গোবিন্দ!—অসুখ ব'লে কি জপ-তপ বন্ধ রাখতে পারি রে, মাধব? দেহ আগে না, ধর্ম্ম আগে বাবা?

গৌরগোপাল সামান্য একটু জ্বরানুভব করিতে লাগিল। শিষ্য মাধবচন্দ্র তাহার বার্লি সেবনের আয়োজন করিয়া দিয়া, তাহার নাড়ীটি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পাড়ার মতি ঠাকুরকে ডাকিতে গেল।

মতি ঠাকুর অর্থাৎ শ্রীযুক্ত মতিলাল পাঠক মাধবের সঙ্গে তখনই আসিল। আসিবার সময় তাহার একমাত্র

নবমবর্ষীয়া কন্যা ময়না জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় যাও, বাবা ?

মতি কহিল,—মাধবের ঠাকুর মশাইকে দেখতে।

বালিকা সাধারণ মেয়েদের তুলনায় একটু বোকা-ধরণের ছিল। সে মনে করিল,—মাধবের ঠাকুরমশাই —সে বোধ হয় একটা কিছু দেখিবার জিনিষ, তাই ময়নাও পিতার হাত ধরিয়া আসিল। কিন্তু সদর দরজায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিল যে, ঠাকুর মশাই আর কিছু নহে, তাহারই মৃত ঠাকুরদাদার মত পাকা চুল ও পাকা দাড়ী-গোঁফবিশিষ্ট এক বৃদ্ধ, তখন সে আর চণ্ডীমণ্ডপের উপর না উঠিয়া সদরের চৌকাঠে ঠেস দিয়া দরজা ধরিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

গৌরগোপাল ময়নাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ওটি কে আপনার—

ওটি হ'ল আমার কন্যা। ঐ এখন আমার সব। ঐটিকে নিয়েই সংসার-বন্ধনে প'ড়ে আছি। ওকে দু'বছরের রেখে স্ত্রী মারা যায়। তারপর মা গেল, ভাই গেল, ভাজ গেল, বাপটি এতদিন ছিলেন, তিনিও গেল বছর বাগ্দীদের সঙ্গে তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে—দাঙ্গা করতে গিয়ে অপঘাতে গেলেন

মারা এমন যে খুব বুড়ো হয়েছিলেন, তাও না। এই আপনাদেরই বয়সী ছিলেন আর কি। তারপর মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া কন্যার দিকে চাহিয়া কহিল, এখন এইটিকেই কারো হাতে একবার গছিয়ে দিতে পাল্লেই ঝঞ্ঝাট্ নিশ্চিন্দি।

গৌরগোপাল ময়নার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার পর কহিল,—মেয়ে আপনার খাসা মেয়ে,—সুলক্ষণা কন্যা। তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—আমারও প্রায় এই রকমই অবস্থা। বাড়ীতে এক স্ত্রী ছাড়া আর কেহই নেই,—তাও চিররুগ্না—আর বাঁচবেও না বেশী দিন। শরীরের যা অবস্থা, কবে এক দিন টপ্ ক'রে মরে যায়! খেটে-খুটে বিষয়-সম্পত্তি, টাকা কড়ি, গয়না-গাঁটি যা করেছি, তা ত আর নেহাৎ কম নয়। তাই ত গিন্নীকে বলি যে, 'জমীদারী কেনো, জমীদারী কেনো' যে বল, তা কিনিই যদি—অবশ্য কিনতে ত এখনই পারি—কিন্তু তা ভোগ করবে কে? তাই ত তাঁকে বলি যে, যা রেখে গেলুম, একটা বড় জমীদারীরই আয়। হঠাৎ যদি একটা ভাল মন্দই হয়ে পড়ে ত তুমি একটা স্ত্রী—আর একটা না হয়ে যদি দশটাই থাকতো তা হ'লেও

সাত পুরুষ পায়ের উপর পা দিয়ে,—রাজার হালে খেয়ে প'রে চ'লে যাবে। গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! রাধারাণীই ভরসা !

রাত্রিকালে শুইয়া শুইয়া গৌরগোপাল জগন্নাথকে কহিল,—আজকাল বছর যাচ্ছে না জল যাচ্ছে। পাঁচ-ছয়টা বছর ত দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কেটে যায়।

জগন্নাথের ঘুম আসিয়াছিল, কহিল,—"তা যায় বই কি। কেন বল দেখি ?

না—তাই বলছি। হাঁ রে, তোর ক্ষুদীর একটি ছেলে হয়েছে,—না ?

হ্যাঁ ঠাকুর, আপনাদের আশীর্ব্বাদে একটি খোকা হয়েছে আজ মাস কতক হ'ল।

ছাখ একবার ! সেই ক্ষুদী—এই সে দিনও ন্যাংটো হয়ে আমার সামনের পড়োটায় লুকোচুরী খেলে, ছুটোছুটি ক'রে বেড়াত, আজ সে ছেলের মা হয়ে গেল। মেয়েমানুষের বাড় কি সোজা ! কথায় বলে—মেয়ে-ছেলের বাড়—না কলাগাছের বাড় !

পরদিনও গৌরগোপালের গৃহে ফেরা হইল না। শরীর খারাপ।

নাড়ী দেখাইবার জন্য নিজেই সকালবেলায় পাইচারি

করিতে করিতে গৌরগোপাল মতি পাঠকের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর অনেক বেলায় যখন ফিরিয়া আসিল, তখন জগন্নাথকে কহিল, জগ, অনেক কথা আছে, বাবা! কিন্তু খবরদার, কারুর কাছে কোন কথা এখন যেন না প্রকাশ হয়। দিন •দশ বারো এখন বাড়ী ফেরা বন্ধ রইলো আর কি।

তাহার পর দুই একদিন ধরিয়া গৌরগোপাল, মতি পাঠক ও মাধব তিনজনে মিলিয়া কিসের একটা শলা-পরামর্শ করিতে লাগিল এবং তাহারই ফলে পনের দিন গুপীনাথপুরে কাটাইয়া গৌরগোপাল শিষ্য মাধব স্বর্ণকারের প্রণাম ও প্রণামী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নবম-বর্ষীয়া বালিকারও পাণিগ্রহণ করিয়া, একদিন সকালে যখন আপন গৃহ-উদ্দেশে যাত্রা করিল, তখন পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক শ্বশুর মতি পাঠক, বাহান্ন বর্ষবয়স্ক জামাতা গৌরগোপালের মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিল,—পৌঁছেই একখানা পত্র দিতে ভুলো না, বাবাজী!

৩

দোল শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গৌরগোপাল এবার দোলে ব্যয়ও যেমন বেশী করিয়াছে, তাহার উৎসাহেরও তেমনই অন্ত ছিল না।

প্রাতঃকালে জগন্নাথ আসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া কহিল,—ঠাকুর, আমার পাওনাটা এবার চুকিয়ে দাও।

গৌরগোপাল কহিল,—তোর আমি হিসেব করেই রেখে দিয়েছি, নিয়ে যা, বলিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল ও কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জগন্নাথের হাতে তিনখানি দশটাকার নোট দিয়া কহিল,—দেখ বাবা জগ, তোর হয়েছে দুমাস তিন দিন—অর্থাৎ তেষট্টি দিন, তা হলেই ৷৷০ আনার হিসেবে হল ৩১৷৷০টাকা। এই তিরিশ টাকা নিয়ে যা এখন। বাকী ১৷৷০টাকা দুচার দিন পরে এসে নিয়ে যাস।

জগন্নাথ নোট তিনখানি হাতে লইয়া কহিল,—আট আনা করে কি গো? দশ আনার হিসেবে ত কথা ছিল।

তা ছিল বটে, কিন্তু তুই নিজেই দেখ্‌লি ত পাওনা-থোওনা এবার একেবারেই কম। তা যা, পূরো দুটো টাকাই এসে নিয়ে যাস এক দিন।

জগন্নাথ নারাজ হইল। ধান কাটিবার সময় সে কাজের ক্ষতি করিয়া গিয়াছে, সুতরাং দশ আনা রোজের কমে সে কিছুতেই লইতে স্বীকৃত হইল না।

গৌরগোপাল কহিল,—হ্যাঁ রে, সামান্য দু-পাঁচটা টাকার জন্যে আমার সঙ্গে কি এতটা পেড়াপীড়ি করতে আছে রে? আমি যে তোকে আশীর্ব্বাদ করব, সেটা কি টাকার চেয়ে কিছু কম হবে রে, বাবা? বলিয়া পৈতায় আঙ্গুল জড়াইয়া তাহার মস্তকোপরি হস্তার্পণ করিল। কিন্তু জগন্নাথ অচল, অটল, কহিল,—আশীর্ব্বাদের বদলে আমার পাওনার টাকাটাই তুমি চুকিয়ে দাও, ঠাকুর!

গৌরগোপালও আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর টাকা ছাড়িতে একেবারেই নারাজ। সুতরাং এই লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা রাগারাগি ও বকাবকি হইয়া যাইবার পর জগন্নাথ গজগজ করিতে করিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রিতে গোস্বামী-গৃহিণী আসিয়া কহিল,—হ্যাঁগা, জগন্নাথের সব টাকা চুকিয়ে দাও নি কেন?

গৌরগোপাল একটু বিরক্ত হইয়াই কহিল,—দিই নি কি রকম? সে দিই না দিই, জগা আর আমি বুঝবো—তোমার মেয়েমানুষের সে সব কথার দরকার কি?

মেয়েমানুষের দরকারটা আজই হঠাৎ বুঝি উঠে গেল? তা, আহা-হা, সে বেচারা গরীব মানুষ, তার—

গরীব মানুষ বলে ত আর—লুটিয়ে দিতে পারি না। ও ব্যাটাদের কি, ওদের দিতে পাল্লেই ভাল। এদিক-সেদিক করে আমায় ত দুপয়সা সঞ্চয় ক'রে যেতে হবে।

হ্যাঁ, সঞ্চয় করে যেতে হবে বৈ কি! দু'দিন বাদে ছেলে হবে—সঞ্চয় ত করতেই হবে!

গৌরগোপাল আড় হইয়া শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া কহিল,—কি বলছো?

বলছি যে, কথাটা লুকোবার কি দরকার ছিল বল? কথা কি আর চাপা থাকে?

কিসের কথা?

এই বিষয় সম্পত্তি ভোগ করবার জন্যে ছেলে হবে ত, সুতরাং সঞ্চয় চাই বৈ কি। বলিয়া গোস্বামী-গৃহিণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—তবে তাই যদি ইচ্ছেই ছিল, তবে বছর দশ পনের আগে কল্লেই সব দিকে দেখতে শুনতে ভাল

হত কি না! এখন এটা কি জান—বাকী কথাটা শেষ না করিয়াই করুণাময়ী যেমন আসিয়াছিল, তেমনই চলিয়া গেল।

দিন পাঁচ সাত পরে একদিন রায়েদের মহিম অন্দরে প্রবেশ করিতে করিতে জড়িত কণ্ঠে হাঁকিল,—কোথা গো, বৌদি। এই যে, দাদা। উঠোনে পায়চারি করতে করতে নতুন বৌদির মুখখানা ভাবছো না কি, দাদা!—হা হা হা হা! ভাগ্যিস ধরে ফেল্লুম্, নইলে এখনই টোক্কর খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিলে আর কি। আচ্ছা দাদা, আমরা দিনরাত জলের পথে বেড়িয়েও ঠিক থাকি, আর তুমি শুক্‌নো পথে চলো দাদা, তবু টলে পড়?

গৌরগোপাল কহিল,—তৈরী হয়ে আছিস্ বুঝি?

ঈষৎ টলিতে টলিতে মহিম কহিল,—আজ হল গিয়ে পয়লা বৈশাখ—বছরের প্রথম দিন—২৪ ঘণ্টা তৈরী থাকতে হবে, তবে ত গোটা বছরটা কাটবে ভাল।—বলি, নতুন বৌদিকে আনছ কবে বল? কোথা গো, বৌদি, বেরোও না একবার! এখন আর শুধু বৌদি বলে ডাক্‌লে হবে না, কেলাস্ ভাগ করে ডাক্‌তে হবে—নইলে বুঝতে গোলমাল হবে। বলি, ও বড় বৌদি!

দেখ মোহে, তোর একেবারে হ্রস্বী-দীর্ঘা জ্ঞান নেই।

আরে হ্রস্বী-দীর্ঘী জ্ঞান থাকলে ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হয়ে যেতুম।—আচ্ছা দাদা, তোমার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু মেয়ের বাপটি যে এই হত্যাকাণ্ডটা করলে, রাজার আইনে না হয় এর কোন প্রতীকার নেই, কিন্তু সমাজ থেকে কেউ এর কোন কঠিন শাস্তির বিধান করলে না? শাস্তির যদি ব্যবস্থা থাকতো, তা হলে এর উচিত শাস্তি কি জান—শূল! গুলী ক'রে মারা—কুকুরকে দিয়ে খাওয়ান! অন্ততঃপক্ষে, নাক-কাণ কেটে গাঁ থেকে বার করে দেওয়া!

গৌরগোপাল উঠান হইতে দালানে উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মঙ্গল উঠানের ধূলার উপরেই বসিয়া পড়িয়া অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল,—আমি দাদা, একটু মুখ-ফোঁড় জানই ত। স্পষ্ট কথা বলবো, তা তাতে আমার চক্ষুলজ্জাও নেই, ভয়ও নেই। বৌদি আমার মা-লক্ষ্মী, এমন লক্ষ্মী ঘরে থাকতে, দাদা, আবার এই বুড়ো বয়সে এক হ্যাঙ্গাম জুটিয়ে ফেল্লে? কি 'লঙ্কা-মণ্ডল' তালুক তোমার আছে দাদা, যে, ছেলের অভাবে জমীদারী তোমার ভেসে যাবে? সম্পত্তির মধ্যে ঐ ত বিঘে বিশ পঁচিশ জমী। আর, সেই মংলবই ছিল যদি বছর পনর ষোল আগে করলেই ত পারতে!

ঘরের মধ্য হইতে দালানে বাহির হইয়া আসিয়া গৌরগোপাল কহিল, তুই একটা মাতাল, মুখ্যু, জঘন্য, যাচ্ছেতাই! কেন যে বিয়েটা হঠাৎ করতে হল, সে গূঢ় হেতুটা না জেনে শুনেই— কতকগুলো খালি মাতলামী করতে আরম্ভ করলি কি না!

মহিম সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—থুড়ি, দাদা, বড্ড ভুল হয়েছে! শুভ-বিবাহটির আবার যে কোন গূঢ় হেতু আছে, তা জানতুম না। তাই ত বলি, দাদা আমার বিনা হেতুতে—'তা' হেতুটা কি, একবার শুনিয়ে দাও দাদা, তবু মনটাকে প্রবোধ—

তুই কি একটা মানুষ, না তোর কোন হেড্ আছে? তোকে বলায় না বলায় সমান! মুহূর্ত্তখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া গৌরগোপাল একটু রুখিয়া কহিল— স্বয়ং গোবিন্দ যেখানে স্বপ্নে দেখা দিয়ে, কন্যাকে নির্দ্দেশ ক'রে আদেশ কচ্ছেন, সেখানে—

মহিমের উচ্চ হাস্যরবে গৌরগোপালের বাকী কথা মুখের মধ্যেই রহিয়া গেল। মহিম হাসিয়া লুটাইতে লুটাইতে কহিল,—বলিহারি যাই, দাদা! তা হ'লে স্বপ্নাদ্য বিয়ে! দাদা গো, গায়ে এই দেখ কাঁটা দিয়ে উঠছে। উঃ—গোবিন্দ দেখা দিয়ে, স্বয়ং চার হাত এক

—উঃ, বৌদি গো,—গোবিন্দ! শ্রীগোবিন্দ! তোমার এই লীলে? দাদা, আগে কাঁটা দিয়ে উঠছিল, এখন আবার দেখ দাদা, গা ঘামছে!

গৌরগোপাল পূজার ঘরের দিকে যাইতে যাইতে কহিল,—দেখ্ মোহে, পূজোয় বস্তে যাচ্ছি আমি, বাজে বক্‌বক্ করিস্ নি কিন্তু, ব'লে দিচ্ছি।

আজ বছরের প্রথম দিনে তু'টো উচিত কথা ব'লে যাই, দাদা। বেশী বক্‌বক্ আর কোরবো না। ভগবান্ করুন, নতুন বৌদির পেটে তোমার, একটা কেন, শত পুত্র হোক।—কিন্তু, হ'বার যদি হোত দাদা, তা হ'লে, ঠিক বলতে পারি না,—হয়ত এই বৌদি থেকেই হোত। জান ত—পুলিন বিশ্বেস চার-চারবার বিয়ে করলে, কিন্তু একটারও ছেলে হ'ল না। কিন্তু শেষকালে ছোট বৌটা শাশুড়ী ননদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর পুলিনের অত্যাচারে ঘরে তিষ্ঠতে পারলে না ত? এখন গিয়ে দেখ গে যাও, যা'র আশ্রয়ে এখন সে আছে, ঠিক বিয়ে-করা স্ত্রীর মতই আছে। আর তার সেই ঘরে আজ ছেলে-মেয়ে আর ধরছে না। সুতরাং দোষটার শুধু একতরফা বিচার করলেই ত আর হয় না!—আর বেশী বোকবো না, দাদা। এর পর হয়ত লাঠি নিয়েই তেড়ে

তেড়ে আসবে। সুতরাং, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায়ের এখন প্রস্থান, বলিয়া মহিম দাঁড়াইয়া উঠিল এবং চলিতে চলিতে সুরাবিকৃত কণ্ঠে কহিল,—শুধু প্রস্থান নয়, এই —এই—টলিতে টলিতে হেলিতে দুলিতে প্রস্থান।

মহিম চলিয়া গেল। গৌরগোপাল তখন পূজার ঘরে বসিয়া স্তব পাঠ করিতেছিল,—

যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ায়া-
স্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয় সেবনায়!

৪

আশ্বিনে অম্বিকার পূজায় ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

করুণাময়ী গৌরগোপালকে কহিল,—হ্যাঁ গা, ময়নাকে ত সেখানে ফেলে রাখলে চলবে না। তাকে তুমি নিয়ে এস এখানে। বাপের কাছে তা'কে আমি রাখবো না। সে এসে আমার কাছে থাকুক এখন থেকে।

গৌরগোপাল কহিল,—এখন একেবারেই ছেলেমানুষ, এখন বছর দু'তিন বাপের কাছেই থাক,—বুঝছ না?

করুণাময়ী জেদ করিয়া বলিল,—না—না, ছেলেমানুষ বলেই ত এখনি তাকে আমার কাছে এনে রাখতে হবে। এখন থেকেই তা'কে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে—

সদর দরজা ঠেলিয়া পোষ্টাফিসের পিয়ন হরিচরণ বাটীর মধ্যে ঢুকিতেই করুণাময়ীর মুখের বাকা কথা আর বাহির হইল না। হরিচরণের হাতে একটি ছোট পার্শেল ছিল। তাহার পিছন পিছন মহিমও টলিতে টলিতে প্রবেশ করিয়া কহিল,—কি এল দাদা, পার্শেলে?

নূতন বৌদির কাছ থেকে বিজয়ার য়্যাড্‌ভান্স্‌—পেন্নাম—না, শক্তি ঔষধালয় থেকে মোদক ? তা এখন থেকেই নিয়ম ক'রে একটু একটু—

মহিমের কথায় বাধা দিয়া করুণাময়ী তাহাকে বলিল,—ঠাকুরপো, একটা কথা শুনবে ভাই, লক্ষ্মীটি ? একবার এই রান্নাঘরের দিকে এস।

মহিম রান্নাঘরের দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। করুণাময়ী কহিল,—সংসারে একলা হওয়া যে কি পাপ, তা আর কি বলবো, ভাই ! একটা তিন বছরের মেয়েছেলে পর্য্যন্ত নেই যে তার সঙ্গে দু'টো কথা কই। বিয়ে করেছে, না বেঁচেছি ঠাকুরপো,—তবু একটা কথা কইবার জুটি পাব।

মহিম কিছু বলিতে যাইতেছিল, তৎপূর্ব্বে করুণাময়ী আবার কহিল,—যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে'! মানুষে তার কি আর কোন রদ্‌-বদল কর্ত্তে পারে ?—ঠাকুরপো, দাঁড়াও ভাই একটু, বলিয়া করুণাময়ী আঁশ-চুবড়ির ঢাকা খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে খানকতক কোটা পোনা মাছ লইয়া মহিমের হাতে দিয়া কহিল, খিড়কীর পুকুর থেকে আজ ধরিয়েছিলুম। এই বেলা বাড়ী গিয়ে বৌকে দাও গে, ঠাকুরপো ঝোল রাঁধবে এখন !

মহিম চলিয়া গেল।

রাত্রিতে করুণাময়ী গৌরগোপালকে আবার কহিল, তুমি ময়নাকে শীগ্গীর এখানে নিয়ে এস।

কার্ত্তিকমাসেই গৌরগোপাল ময়নাকে এ বাটীতে লইয়া আসিল। কিন্তু সে বাপের অত্যন্ত আদুরে মেয়ে ছিল। বাপকে ছাড়িয়া সে এখানে কিছুতেই থাকিতে পারিল না, কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল। সুতরাং কার্ত্তিকের শেষভাগেই আবার তাহাকে গোপীনাথপুর রাখিয়া আসিতে হইল।

বৎসর ঘুরিয়া আবার দোলের উৎসব নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গৌরগোপাল যথা-সময়ে শিষ্যবাড়ী-ভ্রমণে বাহির হইল এবং দোলের দিন-দুই পূর্ব্বে সামান্য একটু জ্বর ও সর্দ্দি লইয়া এবার গৌরগোপাল গৃহে ফিরিল। তাহার পর দুই তিন দিন ধরিয়া অসুস্থ শরীরের উপর দিয়া বেশ একটু অনিয়ম, অত্যাচার, পরিশ্রমও হইয়া গেল। ফলে, দোলের পরই গৌরগোপালকে শয্যা আশ্রয় করিতে হইল।

দুই এক দিনের মধ্যেই অসুখ মারাত্মক হইয়া উঠিল। গ্রামের ডাক্তারের পরামর্শে করুণাময়ী মহকুমা হইতে

ডাক্তার আনাইল এবং নিজে আহার-নিদ্রা একরূপ ত্যাগ করিয়াই স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চৈত্রমাসের শেষ দিনে, রাত্রিশেষে, বর্ষশেষের সঙ্গে সঙ্গে গৌরগোপালের জীবন শেষ হইয়া গেল।

চোখের জলের সঙ্গে, ইহার পর, করুণাময়ীর ছয় মাস কাটিয়া গেল।

তাহার পর একদিন গোপীনাথপুরের মতি পাঠক তাহার দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার হাত ধরিয়া হঠাৎ এ বাটীতে আসিয়া দর্শন দিল।

করুণাময়ী প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে, মতি তাহার কন্যার হইয়া এখানকার বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়া লইয়া ভোগ-দখল করিতে আসিয়াছে। কিন্তু দুই দশ দিন পরে ইহা ভাল করিয়াই বুঝিল; এবং আরও ছয় মাস পরে বুঝিবার শেষ সীমায় আসিয়া ইহাই দৃঢ় স্থির করিল যে, এ সংসারে আর তাহার একটি দিনও থাকা চলিবে না।

প্রতিবাসীরা আসিয়া অনেক করিয়া করুণাময়ীকে বুঝাইল, ভরসা দিল; কিন্তু করুণাময়ী কিছুতেই এখানে আর থাকিতে চাহিল না।

ত্রিসংসারে করুণাময়ীর আর কেহই ছিল না, ছিল কেবল একটি ছোট ভাই। এই ভাইটি চাকুরীসূত্রে পুত্র-পরিবার লইয়া কাশীতে থাকিত। চৈত্রের শেষে করুণাময়ী ভ্রাতাকে পত্র লিখিয়া আনাইল ও ৩১শে চৈত্র স্বামীর মৃত্যুদিনে সারা রাত্রি স্বামীর ঘরে কাঁদিয়া কাটিয়া ১লা বৈশাখ চিরকালের জন্য স্বামীর ঘর ত্যাগ করিয়া ভ্রাতার সহিত কাশীযাত্রা করিল।

৫

বারো বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

করুণাময়ী কাশীতে ভ্রাতার সংসারেই তাহার শেষের দিনগুলি কাটাইতেছে। সমস্ত সকালটা মন্দিরে মঠে ঘুরিয়া, ঠাকুর-দেবতা দর্শন করিয়া আসিবার পর অবশিষ্ট দিনটা তাহার ভ্রাতার ছেলেমেয়েগুলি লইয়াই এক রকম গোলমালে কাটিয়া যায়।

তখনও সন্ধ্যার কিছু বাকী ছিল, কিন্তু নিকটস্থ কুচবিহারের কালীমন্দির হইতে সন্ধ্যার নহবৎ বাজিতে শুরু করিয়াছিল। তাহার তিন বছরের ভ্রাতুষ্পুত্রটি ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিল, 'পিথিমা, দেখবে এথো, কালা থব দাঁলিয়ে লয়েতে।

করুণাময়ী তাহাকে বুকের কাছে চাপিয়া কহিল—কোথায়, বাবা?

'ওই দে, থামনেল বালিল্ থাতে।

করুণাময়ী বারান্দায় আসিয়া সামনের বাড়ীর ছাদের দিকে দেখিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না।

নীচে আসিয়া শরৎকে জিজ্ঞাসা করিল, সামনের বাড়ীখানাতে কারা এসেছে রে ?

শরৎ কহিল,—কলকাতা থেকে জনকতক বাবু দু-তিনটে বেশ্যা সঙ্গে ক'রে এসেছে। বাড়ীটা এক মাসের জন্যে ভাড়া নিয়েছে।

করুণাময়ী কহিল,—তুই একবার খবর নিতে পারিস, বাবুরা সব এখন বাসায় আছে কি না ?

শরৎ গিয়া খবর লইয়া আসিয়া কহিল,—না, এখন তারা সব বেড়াতে গিয়েছে, সন্ধ্যার পর সব ফিরবে। কেন দিদি ?

আমি একবার ঐ বাড়ীতে যাব।

সে কি গো ?

হ্যাঁ, যাব,—আমার দরকার আছে। তুই একটিবার আয় না, ভাই, আমার সঙ্গে, সদর-দরজায় দাঁড়িয়েথাকবি এখন।

বেশ্যা তিনটি ছাদের যেখানে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিক দেখিতেছিল, করুণাময়ী সেইখানে আসিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠা যুবতীটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে, বিশেষ তাহার বামচক্ষুর কোলে যে বড় একটি আঁচিল ছিল, তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি ময়না ?



বাইশ-তেইশ বৎসরের সেই মেয়েটির মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না—অবনত মস্তকে কাঠের মূর্ত্তির মত সে শুধু মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

করুণাময়ী চক্ষু অবনত করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—বছর কয়েক হল নন্দাদের ন'গিন্নী যেবার কাশী এসেছিল, এই রকম একটু আভাস যেন দিয়ে গিয়েছিল বটে !

পরদিন করুণাময়ী শুনিল, সেই রাত্রিতেই তাহারা সে বাসা ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছে।

এক বৎসর

১

তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল এক দিন ট্রেণের মধ্যে। আজ হঠাৎ নিজের গ্রামের মধ্য দিয়া তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া. অক্ষয় বিস্ময়ে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল ; কহিল,—এ কি ! আপনি যে ! এ দিকে কোথায় এসেছিলেন ?

তিনি সচকিতে ফিরিয়া দেখিয়া কহিলেন.—এই যে, আপনি ? এই গাঁয়েই আপনার বাড়ী ? আমি একটি মেয়ে দেখতে এসেছিলাম, আপনাদের এই পাশের গ্রাম নবগ্রামে। আছেন ভাল ? আপনাদের কোন্ বাড়ী ?

অক্ষয় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল, আদর-অভ্যর্থনা করিল এবং সে বেলাটা থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার জন্য আহারাদির যোগাড়ে প্রবৃত্ত হইল।

লোকটির নাম রামগতি রায় ব্রাহ্মণ, হুগলী জেলার

এই দিকেই কোন গ্রামে তাঁহার বাটী। কিন্তু তিনি গ্রামে থাকেন না। বহুদিন হইল, গ্রামের বাস তুলিয়া দিয়া, সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। নিজের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিলেন,—ত্রিশ বচ্ছর পর্যান্ত দেশে থেকে উৎসন্ন যেতে বসেছিলুম আর কি! এই বচ্ছর দশ বারো হ'ল, এখান থেকে কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে তবে ত বেঁচেছি। বাস করবার স্থান বটে। এক পা হাঁটতে হবে না, একটু ধূলো-বালি নেই, খাবার জিনিষ অজস্র; ভাদ্রমাসে কমলা খাও, আশ্বিন মাসে আম খাও, কার্ত্তিক মাসে পটল খাও। তার পর আমোদ-প্রমোদের চূড়ান্ত ব্যবস্থা, থিয়েটার দেখ, বায়স্কোপ দেখ,' ফুটবল, ঘোড়-দৌড়, সভা-সমিতি, মিটিং; আর পয়সার ছড়াছড়ি—হরির লুঠ ব্যাপার, কুড়োতে পারলেই হল।—অমরাবতী—অমরাবতী!

অক্ষয় কহিল,—সবই ত ভাল, কিন্তু এই—এইটে আসবে কোত্থেকে। বলিয়া বৃদ্ধও তর্জ্জনী আঙ্গুলের সংযোগে কি একটা সঙ্কেত করিল।

রামগতি কহিলেন,—কলকাতা হল পয়সার যায়গা। সেখানে পয়সা হবে না ত কি হবে আমার এই জঙ্গল আর ধানক্ষেতের মধ্যে?

এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বহু আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ হইল এবং তাহার ফলে দরিদ্র অক্ষয় একরূপ স্থির করিয়াই ফেলিল যে, ভাদ্রমাসটা কাটিলেই সে কলিকাতায় চলিয়া যাইবে এবং পল্লীজীবনের এই দুঃখ, কষ্ট ও দীনতার অন্ত করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া অর্থার্জ্জন দ্বারা সে অমরাবতীর সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিবে।

একটি একটি করিয়া ভাদ্রমাসের শেষ কয়টা দিনও কাটিয়া গেল। আকাশের রংয়ে ও বাতাসের স্পর্শে শরৎ তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল সোনালী রূপটি ছড়াইয়া দিল। দুঃখের দীর্ঘ অশ্রুবর্ষণের পর যেন অজানা কাহারও সান্ত্বনা পাইয়া ধরিত্রীর সর্ব্বাঙ্গে অনির্ব্বচনীয় পুলক লাগিয়া গেল।

গ্রামেতেই পূজা। বারোয়ারীর দুর্গোৎসব। গাঁয়ের লোক এক বৎসরের দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অশান্তি ভুলিয়া গিয়া আসন্ন পূজার আনন্দে অন্তর ভরাইয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় মহা-উৎসব। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী-দরিদ্র সুস্থ-অসুস্থ, সকলেরই অন্তরে আশা, উৎসাহ, আনন্দ ; মুখে সকলেরই হাসি।

কিন্তু অক্ষয়ের মুখের হাসির অন্তরালে এ সময়টা দুশ্চিন্তার একটা ছায়া গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। ঘরে

তাহার অন্ন নাই, হাতে তাহার অর্থ নাই। কারণ, গাঁয়ের জমীদারী সেরেস্তার যে কাযটুকু সে করিত, কয় মাস হইল, সে কাযটি তাহার গিয়াছে। টাকা-কড়ির গোলমাল লইয়াই ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল। সংসারে যেমন তাহার অন্য কোন পরিজনও ছিল না, তেমনই বিষয়-সম্পত্তিও তাহার কিছুই ছিল না, তাই উদরান্নের জন্য ইতিমধ্যে কয়েকবার সে গাঁ ছাড়িয়া কলিকাতায় বা অন্য কোথাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গাঁ ছাড়িয়া যাওয়া তাহার হয় নাই। গাঁয়ের মাটি এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের বাঁধন দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল. গাঁ-ছাড়া হইয়া যাইতে সে পারে নাই।

কিন্তু কলিকাতার কথা সে জানে—ভাল করিয়াই জানে। তাই কখন মনে ভাবে, সেখানে যদি একবেলা আধ পেট ভরিয়া খাইয়াও তাহার দিন কাটে, তাহাতেও তৃপ্তি, তাহাতেও সুখ। গ্রামের ঘোষেদের বাড়ীর নগেন, রাজেন, রায়েদের সুকুমার, ও পাড়ার দুর্লভ,—এরা যখন কলিকাতা হইতে বাড়ী আসে, অক্ষয় তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মনে মনে ভাবে, এদের মত সৌভাগ্য যদি তার হয়! সত্যি, কি সুখে লোকে গাঁয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া যারা,

তাদের ভাগ্যেই এই জল-কাদা, বন-জঙ্গল, বাঁশবাগান, আর তেপান্তরের মাঠ!

সেদিন অক্ষয় এই সব কথাই ভাবিতে ভাবিতে বারোয়ারী-তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সকালবেলা, সেখানে প্রতিমার গায়ে রং দেওয়া হইতেছিল আর পাড়ার যত ছেলে মেয়ে সেইখানে জমা হইয়া পোটোকে ঘিরিয়া একটা মহা হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিয়াছিল। ফটকে বলিতেছে, হ্যাঁ পোটো-দাদা, সিঙ্গীর ন্যাজে রং দিলে না? গিরে বলিল,—এ কি গো! মা দুর্গার কপাল দিয়ে যে রং গড়িয়ে পড়ছে! মুখুয্যেদের রাণী কহিল,—ওগো, আমার এই খুরিতে একটু রাঙ্গা রং দাও না, আমার পুতুলের বৌয়ের পায়ে আল্‌তা পরাব।

অক্ষয় একটু দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে পটুয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল,—চক্কোত্তি মশাই, এবার রংয়ের দামটাম সব চড়ে গেছে, এবার কিন্তু একটু বিবেচনা করতে হবে। অক্ষয় যাইতে যাইতে কহিল,—এবার আর আমার সঙ্গে পূজোর কোন সম্পর্ক নেই, হরি। এবার বারোয়ারীর ম্যানেজার হচ্ছে জ্ঞানবাবু। জ্ঞানবাবুকে বোলো।

কথাই তাই বটে। অক্ষয়ের সহিত এবার বারোয়ারীর

পূজার কোন সম্পর্ক নাই। তাহার কারণ, গেলবারের টাকা হইতে নাকি অক্ষয় কি-সব গোলমাল করিয়াছে। গেলবারের তহবিল তাহার কাছেই ছিল। অক্ষয় সকলের সহিত ইহা লইয়া ঝগড়া করিয়াছে, বলিয়াছে, আমি কি চোর? এতই যদি অবিশ্বাস, তা হলে আর পূজোর ব্যাপারে আমি থাকবো না, আমাকে কেউ আর ডেকো-টেকো না। গোলমাল যে কিছু করিয়াছিল, সে কথাটা মিথ্যা নহে। তবুও বারোয়ারীর কর্ত্তারা তাহাকেই পাণ্ডা হইবার জন্য সাধাসাধি করিয়াছিল, কিন্তু অক্ষয় রাগে হউক, অভিমানে হউক, এবার সে পূজার কোন কথাতেই ছিল না। তবে শেষের দিকে সে স্থির করিয়াছিল যে, ইহার পর আর একবার যদি উহারা বলিতে আসে, তখন না-হয় তহবিল আবার হাতে লওয়া যাইবে।. কিন্তু আর কেহ এ কথা বলিতে আসে নাই, সুতরাং অভিমান তাহার চরমেই উঠিয়াছিল এবং তাহারই ঝোঁকে পটুয়াকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, ম্যানেজার হচ্ছেন এবার জ্ঞানবাবু. যাও, তাঁর কাছে যাও।—ছাগল দিয়ে কি যব মাড়ানো হয়, হরি? আজ বাদে কাল পূজো, এখনও পর্য্যন্ত পূজার পূ এর যোগাড়ও হয় নি! খরচের ফর্দ্দখানা পর্য্যন্ত এখনও বাবুরা ক'রে উঠতে পারেন নি! এ

কি আর অক্ষয় চক্কোত্তি যে, কলে কায চালিয়ে দেবে!

ষষ্ঠীর দিন পূজাতলায় আগমনীর বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ঢোল ও কাঁসির শব্দ তাহার মনকে খুবই চঞ্চল করিয়া তুলিল। তথায় যাইবার জন্য তাহার প্রবল ইচ্ছা হইলেও সে বাটী হইতে বাহির হইল না। সমস্ত দিন গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সে নানারূপ ভাবিতে লাগিল এবং ভাবিয়া ইহাই ঠিক করিল যে, সে আর গ্রামে কিছুতেই থাকিবে না। মহামায়ার পূজা যেন তাহাকে দেখিতে না হয়! আগামী কল্য প্রত্যূষেই সে কলিকাতায় চলিয়া যাইবে এবং আর কখনও সে গাঁয়ের মাটি মাড়াইবে না।

করিলও তাই। পরদিন অতি-প্রত্যূষে সে তাহার বাড়ীতে তালা বন্ধ করিয়া কলিকাতা যাইবার উদ্দেশে ষ্টেশনের পথে যাত্রা করিল।

২

একমাস হইল, অক্ষয় কলিকাতায় আসিয়াছে। আড়াই টাকা ঘরের ভাড়া ও দুই আনা টেক্স, মোট দু টাকা, দশ আনাতে মাণিকতলার এক বস্তির মধ্যে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া সে থাকে। নিকটেই একটি হোটেল আছে। সেইখান হইতে দুবেলা সে খাইয়া আসে। তিন পয়সার ভাত, এক পয়সার দাল, দুই পয়সার মাছের ঝোল—এই ছয় পয়সার ভিতরেই তাহার এক বেলাকার খাওয়া হয়। কোন দিন ইহার উপর এক পয়সার ভাজা বা এক পয়সার অম্বল।

বাটী হইতে একখানা মোহর সে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। মোহরখানি তাহার ঘরে লক্ষ্মীর হাঁড়ির লক্ষ্মীর ধানের ভিতর তাহার পিতামহের আমল হইতে রক্ষিত ছিল। অক্ষয় কাপড়ে ঘষিয়া তাহার সিঁদুরের দাগ তুলিয়া ফেলিয়া মাণিকতলার বাজারের এক পোদ্দারের দোকানে বিক্রয় করিয়াছিল। তাহাই বিক্রয় করিয়া এই এক মাস তাহার খরচ চলিতেছে। হাতে আর

যৎ-সামান্যই আছে। টানাটানি করিয়া তাহাতে না হয় আরও একটা মাস কোন রকমে চলিতে পারে। কিন্তু তাহার পর? এর জন্য দুর্ভাবনার তাহার অন্ত নাই।

অবশ্য চুপ করিয়াও সে বসিয়া নাই। প্রথম প্রথম কয়েক দিন সে আফিস-আদালতের দিকে খুব ঘুরিয়াছিল, কিন্তু কোন সুবিধা করিতে পারে নাই, পরন্তু এইটাই বুঝিয়াছিল যে, টপ্ করিয়া বাহির হইতে আসিয়া বিনা সুপারিসে কলিকাতায় কোন কাজ যোগাড় করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

এক দিন সে খবর পাইল যে, নিকটে একটি বাড়ীতে ছোট ছোট দু-একটি ছেলেকে দুই বেলা পড়াইবার জন্য একজন মাষ্টারের দরকার। অক্ষয় সেখানে গিয়া দেখা করিল। মাষ্টার একজন চাই বটে, কিন্তু ছেলে দু একটি নয়। ছয় হইতে নয় বৎসর বয়সের তিনটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে। দুই বেলাই পড়াইতে হইবে। মাহিনা ছয় টাকা।

এত দিনের এত চেষ্টার পর এই কাজটি তাহার জুটিয়া গেল। সে মনে মনে নিরুৎসাহ না হইয়া ভবিষ্যতের আশায় তাহার বর্ত্তমান চাকুরীতে উঠিয়া পড়িয়া

লাগিল। দুই বেলা ছেলে পড়াইয়া, বাকী সময়টা সে ইতস্ততঃ চারিদিকেই ইহা অপেক্ষা কোন ভাল কাজের, অভাবপক্ষে কোন ভাল টুইশানির সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহার জন্য 'দৈনিক বসুমতী', 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান,' 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি পত্রিকার 'ওয়ানটেড্‌' কলমগুলিও সে কোন দিনই দেখিতে ভুলিত না। ইহা ছাড়া বাড়ীর দেওয়ালে, ল্যাম্পপোষ্টে, পার্কের প্রাচীরগায়ে যে সব কাগজ আঁটা থাকিত, সেগুলির প্রায় কোনখানিই তাহার চক্ষু এড়াইত না। একই কাগজ হয়ত পনের দিন ধরিয়া রোজই পড়িতেছে। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় প্রত্যহই সে মনে করে যে, আজ হয়ত কোন নূতন খবর কোন না কোন স্থানে দেখিতে পাইবে, কিন্তু নূতন হয়ত পায়, তবে তাহা টুইশানির নয়—বাড়ী ভাড়ার। অক্ষয় যাহা চায়, তাহা আর পায় না। সে আশ্চর্য্য হয় যে, শতকরা নিরেনব্বইখানা কাগজেই বাড়ী ভাড়ার কথা। তা' ছাড়া যদি আর কিছু থাকে ত "For sale-"এর ভূমিকা দিয়া কোন কিছু বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

এক মাস পরে হঠাৎ একদিন একটা ল্যাম্পপোষ্টে তাহার অভীপ্সিত কাগজ আঁটা দেখিতে পাইল—"গৃহ-

শিক্ষক চাই। বেতন পনেরো টাকা।” আনন্দে তাহার মন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু—কিন্তু আসল জিনিষটাই যে নাই। ঠিকানাটা যে কে ছিঁড়িয়া দিয়াছে? একটুও কি বোঝা যায় না?—না, বেশ ভাল করিয়াই ছিঁড়িয়া দিয়াছে। মনটা তাহার খারাপ হইয়া গেল। পরের ল্যাম্পপোষ্টটার কাছে গেল। তাহাতেও ঐ একই কাগজ আঁটা রহিয়াছে বটে, কিন্তু ঠিকানার দুর্দ্দশাও ঐ এক। অক্ষয় আরও অগ্রসর হইল। পর পর যতগুলি ল্যাম্প-পোষ্টে সে “গৃহশিক্ষক চাই” দেখিতে পাইল সকলগুলিরই ঠিকানা নিয়মমত বেশ সুন্দর করিয়া ছিঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তবুও অক্ষয় দমিবার পাত্র নহে। সে পুনরায় প্রত্যেক ল্যাম্পপোষ্ট ভাল করিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল, ঠিকানার কোন সূত্র—কোন একটি-মাত্র অক্ষর যদি পড়িতে পারা যায়। একটি কাগজে “৩” টুকু সে পাইল। আর একখানিতে ‘পার রোড’টুকু কোনরকমে পড়িতে পারিল। ইহা হইতেই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং ষ্ট্রীট্ ডাইরেক্টরী খুঁজিয়া সে রাস্তা-টির নাম আন্দাজে ধরিয়া ফেলিল যে, উহা গড়পার রোডই হইবে। গড়পার না হইয়া জুনিপার রোড হওয়া অসম্ভব। কারণ, জুনিপার রোড্ বালীগঞ্জে।

বালীগঞ্জের লোক তাহাদের সীমানা ছাড়াইয়া এ অঞ্চলে কাগজ আঁটিতে যে আসিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং ‘পার’ এর আগে যে ‘গড়’ ছিল, ইহা বেশই বুঝিতে পারা যাইতেছে। শুধু ৩ হইতে বাড়ীর সঠিক নম্বরটি অক্ষয়ের জানিবার কোনই উপায় ছিল না। উহা ৩ হইতে পারে, ৩০ হইতে পারে, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ইত্যাদি হইয়া ৩৯ পর্য্যন্ত হইতে পারে। তবে ১৩ বা ২৩ বা ৪৩ ইত্যাদি যে হইবে না, তাহা সে বুঝিল। কেন না, ৩-এর পর হইতেই ছেঁড়া হইয়াছে, আগে হইতে নহে। তাহার পর তিন শতের কোঠা ত হইতেই পারে না, কারণ গড়পার রোডে অত সংখ্যা বাড়ী নাই। অক্ষয় স্থির করিল যে, ৩ নং বাটী এবং ৩০ হইতে ৩৯ নং, মোট এই ১১ খানি বাড়ীর প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়াই তাহাকে খোঁজ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

করিলও তাই। একে একে সব বাড়ীতে গিয়া সে বলিতে লাগিল,—বিজ্ঞাপনে দেখলুম, আপনাদের এক জন মাষ্টার চাই।

৩৭ নং বাটীটি বহু পুরাতন। ভগ্ন অবস্থা। তাহারই ছোট বৈঠকখানা ঘরের মেজের উপর একখানা ছেঁড়া

কম্বলের উপর বসিয়া একটি ১৩।১৪ বৎসরের মেয়ে পড়িতেছিল—

আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।

অক্ষয় এক পা এক পা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

এ বাড়ীতে কি এক জন মাষ্টার দরকার, কাগজ মেরে দেওয়া হয়েছে? মেয়েটি মুখ তুলিয়া কহিল,—হ্যাঁ, বাবাই দিয়েছে! দাঁড়ান, বাবাকে ডেকে আনছি! মিনিট দুই তিন পরে মেয়েটির পিতা দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন এবং চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, —এ কি? আপনি অক্ষয় বাবু?

অক্ষয় রামগতি বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া, কি বলিবে খিছু ঠিক করিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রামগতি বাবু কহিলেন,—কলকাতায় তা হ'লে চ'লে এসেছেন দেখছি যে। বেশ বেশ। আজকালকার দিনে পাড়াগাঁয়ে কি আর প'ড়ে থাকতে আছে? এইখানে কোথাও একটু থাকবার সুবিধে ক'রে নিন্; নিয়ে, বুদ্ধি খাটিয়ে চলুন দেখি, এক বছরের ভেতর অবস্থা ফিরে যাবে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের দিন আজকাল নয়। জানেন

ত? কলিতে ধর্ম্ম নিয়ে আঁকড়ে থাকা মানেই দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে প'ড়ে হাবুডুবু খাওয়া, সেটা বুঝেছেন ত? সুতরাং——

একটি ঘণ্টা ধরিয়া রামগতি অক্ষয়ের সহিত কথা কহিল। তাহার ফলে অক্ষয় রামগতির স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারিল। রামগতি কহিল,—আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা থেকেই কেমন ভালবাসা জন্মে গেছে, তাই সব কথা খুলেই বললুম। আসল কথা—বোকা-হাবার দিন আর নেই; একটু চালাক-চোস্ত হওয়া দরকার। এই দেখুন, মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে; খরচ করতেও পারব না, একটা গাঁজাখোর, গুলিখোরের হাতেও ধ'রে দিতে পারবো না। তাই কেমন ফন্দি করেছি বলুন দেখি? পনর টাকা মাইনে কথা লিখে দিয়েছি। যত সব কলেজের ছেলের দল এসে ভীড় করবে এখনি। তার মধ্যে থেকে পছন্দমত একটিকে বাহাল করব। তা'তে শেষ পর্য্যন্ত কি হবে জানেন ত? এক ঢিলে সব পাখী মারব। মেয়েটার পড়াশুনা চলতে থাকবে। মাইনে ত দিতেই হবে না, বরং ওদিক্ থেকে কিছু কিছু আসবারও কথা। শেষকালে সেইটিকেই জামাই ক'রে—হাঃ হাঃ

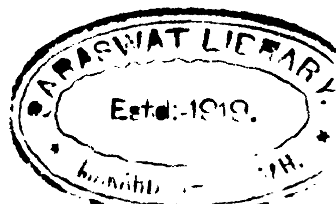
রামগতি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

অক্ষয়ও নেহাৎ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নহে। তাহা হইলেও রামগতির তুলনায় সে কত ছোট, তাহা সে উপলব্ধি করিল এবং আর একদিন আসিয়া-দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে স্বীকার করিয়া সে-দিনের মত বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পথে ঘুরিয়া সে অতিমাত্রায় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল—রামগতির অমরাবতীর সুখৈশ্বর্য্যের নমুনা যাহা আজ মাসাধিককাল সে ভোগ করিতেছে, ইহা যদি তাহার ভাগ্যে অক্ষয় হইয়াই থাকে, তাহা হইলেই—

আর সে ভাবিতে পারিল না।



৩

ছয় মাসকাল নানারূপ দুঃখ কষ্টের ভিতর কাটাইবার পর মাস দুই হইল অক্ষয় এক মুদীর দোকানে একটি কর্ম্ম পাইয়াছে। এই ছয় মাসের মধ্যে এমন দিন তাহার অনেক গিয়াছে, যে দিন তাহার দু'টি অন্নও জোটে নাই; একখানি বস্ত্রাভাবে হয়ত বা ঘর হইতে বাহির পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। তাহার সেই সব দিনে বাসার কেহ তাহার কোন খোঁজ লয় নাই। তাই, ঘরে বসিয়া অনেক দিন অনেক সময় সে ভাবিত যে, গ্রামে থাকিলে এমনটা তাহার কখনই হইত না। বাত্রিশ বৎসর তাহার গ্রামে কাটিয়াছে, ইহার মধ্যে একটি দিনও তাহার অন্নাভাবে কাটে নাই। অসুখ-বিসুখের সময় পাড়ার সকলে বুক দিয়া আসিয়া করিয়া গিয়াছে; দুঃখে সান্ত্বনা দিয়াছে; ব্যথায় সহানুভূতি জানাইয়াছে। ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে স্থির করিত, আর কিছুদিন সে দেখিবে, তারপর রামগতিবাবুর এই

অমরাবতীর মায়া ত্যাগ করিয়া সে তাহার বনে-জঙ্গলে ঘেরা, জল-কাদায় ভরা গাঁয়ের কোলে আবার ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু আজ দুই মাস হইল, মুদীখানার দোকানের এই চাকুরীটি তাহার হইয়াছে। কথা হইয়াছে, এখানে তাহাকে ছয় মাস পেটভাতায় থাকিতে হইবে, তাহার পর মাহিনার বন্দোবস্ত হইবে। ছয় মাসের দুই মাস কাটিয়াছে, আরও চারি মাস এইরূপে তাহাকে কাটাইতে হইবে। কিন্তু শুধু পেটভাতায় যে এক জনের চলিতে পারে না, দুই বেলা দু'টি ভাত ছাড়া প্রত্যহ দু'এক আনা যে আরও আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা অক্ষয়ের মনিবও বুঝিত, অক্ষয়ও বুঝিত। তাই অক্ষয়ের মনিব রাখাল্‌ দাস দত্ত সর্ব্বদাই তাহার উপর এমন কড়া নজর রাখিত—যাহাতে করিয়া সে দোকানের কেনা-বেচার পয়সা হইতে একটি আধলাও কোন রকমে লইতে না পারে। অক্ষয়ও প্রত্যহ দু'চার পয়সা কি করিয়া সরাইতে পারে, তাহার জন্য নিত্যই উপায় উদ্ভাবন করিতে সচেষ্ট থাকিত।

আষাঢ় মাস! অপরাহ্নকাল। পরের দিন রথ। দোকানে খরিদ্দারের ভীড় নাই। উবু হইয়া, দুই হাঁটু

উঁচু করিয়া অক্ষয় চুপ করিয়া তাহার বসিবার বড় চৌকি-খানির উপর বসিয়া আছে। অদূরেই একটা ছোট তক্তাপোষের উপর খাতাপত্র এবং বাক্স সম্মুখে লইয়া মনিব রাখালদাস খতিয়ানে হিসাব উঠাইতেছে। হঠাৎ আকাশে মেঘ করিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। পূর্ব্ব-দিক্ হইতে একটা অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা আর্দ্রবাতাস বহিয়া গেল। অক্ষয় বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কাল রথযাত্রা। কলিকাতায় কিছুই জানিবার উপায় নাই। এখানকার সব দিনই সমান, একঘেয়ে, কোন বৈচিত্র্যই নাই। খালি মাঘমাসে সরস্বতীপূজার সময় পাড়ায় কয়েকটা ঠাকুর দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সে উৎসবের ভিতর যেন প্রাণ ছিল না। যেন প্রতিমার ভিতর দেবতাই ছিল না। আমাদের ওখানে সরকার-বাড়ী যে সরস্বতীপূজা হয়, সে কি ব্যাপার! সেই পূজা আর এই পূজা! ধোৎ!—পাশের গাঁ কার্ত্তিকপুরে কাল কি ধুমই হইবে। আশে-পাশে ৪০।৫০ খানা গাঁ ভেঙ্গে চৌধুরীদের রথ দেখতে আসবে। মনে করেছিলুম এবার রথে তেলেভাজার একখানা দোকান দেবো, কিছুই হ'ল না। ভাল ছিপ একগাছা কেনবার দরকার ছিল, কার্ত্তিকপুরের রথের অপেক্ষাতেই ছিলুম, তাও আর

হ'ল না।—অক্ষয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া গভীর একটা নিশ্বাস বাহির হইল।

একটু পরেই ধূমপান করিবার উদ্দেশ্যে সে তাহার বসিবার চৌকীর পাশের গামলা হইতে এক ছিলিম তামাক লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটি তুলিয়া লইয়া দোকানঘরের বাহিরে আসিল। পার্শ্বে একরত্তি একটু যায়গা নোংরা হইয়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া কলিকার গুল ঝাড়িবার উদ্দেশে উবু হইয়া বসিতেই কাহার মৃদু পদশব্দে ফিরিয়া দেখিল—তাহার একেবারে ঠিক পশ্চাতেই রাখালদাস তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রাখালদাস কহিল,—ব্যাপারটা কি বল দেখি ?

একটু তামাক খাব—তাই—

"তাই গুল ঝাড়তে এসেছ ? কতবার তামাক খাও শুনি ? দেখি তামাকটা। বলিয়াই রাখালদাস ক্ষিপ্রতার সহিত অক্ষয়ের হাত হইতে এক রকম জোর করিয়াই তামাকের ডেলাটা লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মধ্য হইতে একটি সিকি বাহির হইয়া পড়িল।

অক্ষয়ের মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না।

রাখালদাস কহিল,—দোকানের চৌকীতে আর বোসো না, পুলিসে খবরটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এখুনি। সেইখানকার এক স্থানের খানিকটা আলগা মাটির উপর রাখালদাসের নজর পড়িল। মাটীগুলি একটু সরাইয়া ফেলিতেই অপর একটি দুয়ানি সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

ক্রোধে রাখালদাসের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শুধু দুইটি গলাধাক্কা দিয়া অক্ষয়কে দোকানের বাহির করিয়া দিল।

অক্ষয় কোনমতে টাল সামলাইয়া রাস্তার মাঝখানে আসিয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে নিজের বাসার অভিমুখে প্রস্থান করিল।

৪

পথে আসিতে আসিতে একস্থানে অনেক লোকের ভীড় দেখিয়া অক্ষয় সেই দিকে অগ্রসর হইল। ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, রামগতির হাতে হাতকড়া লাগাইয়া ৩।৪টি পুলিস-প্রহরী তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অক্ষয়ের সহিত রামগতির চোখোচোখি হইবামাত্র রামগতি মুখ ফিরাইয়া লইল। অক্ষয় দেখিল, তাহার মুখে কোনরূপ সঙ্কোচ, আশঙ্কা বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই। উপস্থিত দর্শকগণকে জিজ্ঞাসা করিল, অক্ষয় টুকরা টুকরা খবর যাহা জানিতে পারিল, তাহা একসঙ্গে জোড়া দিলে কথাটা এইরূপ দাঁড়ায়।—রামগতির এক দাসী ছিল। সে জাতিতে কৈবর্ত্ত। তাহার একটি ২০।২২ বৎসরের ছেলে ছিল। রামগতি তাহাকে আপন পুত্র পরিচয়ে এক ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছে ও বর-পণস্বরূপ সেই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে তিন শত পঁচিশ টাকা নগদ লইয়াছে।

অক্ষয় আর সেখানে না দাঁড়াইয়া, বাসার অভিমুখে

অগ্রসর হইল। আজ তাহার মনের উপর চারিদিক্ হইতে যেন প্রবল আঘাত আসিতে লাগিল। দেহ-মনে আজ সে অতিমাত্রায় ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল; আজ যেন তাহার চলিবার শক্তি পর্য্যন্ত কমিয়া যাইতেছে। অমরাবতীর সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি বিতৃষ্ণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। মাণিকতলার পোল পার হইয়া, খালের পাড়ের উপর একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে গিয়া সে বসিয়া পড়িল।

তখনও সূর্য্যাস্তের বিলম্ব ছিল।

ও-পারে—দূরে—তেলের ও ময়দার কলের বড় বড় চিমনীগুলি দিয়া অনবরত, ধোঁয়া উড়িতেছে। এ-পারে করাত-কল ছাড়াইয়া পর পর কয়েকটি পাটের গুদাম। তাহার সম্মুখের রাস্তায় গরু ও মহিষের অসংখ্য গাড়ী সারা পথটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গাড়োয়ানদের মধ্যে কিসের একটা 'কমিটী' চলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের কোমরে চামড়ার চাবুক গোঁজা রহিয়াছে। করাত-কলের এ-পাশে একটা উড়িয়ার মুড়ি, চালভাজা, পেঁয়াজ-ফুলুরি, ছাতু ও তেলে-ভাজা জিলাপী প্রভৃতির দোকান। সেখানে লম্বা লাঠি হাতে এক কাবুলী একখানা ছোট চৌকীর উপর বসিয়া উড়িয়াটির দিকে চাহিয়া

কি-সব বলিতেছে ও বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপর সজোরে তাহার সেই লাঠি ঠুকিতেছে। বোধ হয়, উড়িয়াটি কাবুলীর নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়াছে, তাই মাটির উপর মহাজনের এই লাঠির আস্ফালন, তাহার পাওনা স্থদের তাগাদা বলিয়াই বিবেচনা হয়।

বসিয়া বসিয়া অক্ষয় নানা রকম ভাবিতে লাগিল।

এখানকার মানুষের দেহ বুঝি হাড়-মাসে গড়া নয়। লোহা লক্কড় দিয়ে তৈরী। দেহে রক্ত বয় না,—কলের তেল ভরা, তাই কলের মতই দিবা-রাত্রি চলে। একটু মাধুর্য্য নেই, একটু বৈচিত্র্য নেই, একটু রস নেই, একটু কোমলতা নেই। এখানে মানুষ নেই, মাটি নেই, জল নেই, হাওয়া নেই। এ যেন একটা শুষ্ক, অপরিচ্ছন্ন, হট্টগোলের যায়গা। বায়ুহীন, প্রাণহীন, মমতাহীন। সমস্ত সহরটা যেন বাঙ্গালা দেশের একটা প্রকাণ্ড হাট। হাটের গোলমালের মধ্যে মানুষ কি ক'রে থাকে? গাঁ ছেড়ে আর কত দিন এই হাটতলাতে তাকে থাকতে হবে। বছর ঘুরে আসতে চল্‌লো। কিন্তু—কিন্তু—

হঠাৎ ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। অক্ষয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া ভিজিতে ভিজিতে অনতিদূরের একটি পাকা-বাড়ীর রোয়াকের উপর গিয়া উঠিল।

বাড়ীটি ছুই ভাগে বিভক্ত। ছুই ভাগে ছুই ঘর ভাড়াটিয়া। এক দিকের বৈঠকখানায় কয়েকটি বাবু মিলিয়া হার্ম্মো-নিয়ম ও বাঁয়া-তবলা সংযোগে গান করিতেছিল। ও-পাশের অংশের অন্দর হইতে ঠিক সেই সময়ে স্ত্রী-কণ্ঠের উচ্চ ক্রন্দনের রোল উঠিল। মিনিট ছুয়েক পরেই একটি মৃতদেহ হরিবোল-ধ্বনির সহিত ভিতর হইতে বাহিরে আনা হইল। পাশের বৈঠকখানায় সঙ্গীতালোচনা সামান্য কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া আবার সমভাবেই চলিতে লাগিল। ইহাদের কীর্ত্তনের ঢংয়ের টপ্পা "আমি তোমার প্রেমের কৃষ্ণ তুমি আমার রাধা—ওরে বল্ হরিবোল' এর সঙ্গে শ্মশান-যাত্রীদের হরিবোল'-ধ্বনি মিশিয়া গিয়া একাকার হইতে লাগিল। বৃষ্টি তখন থামিয়া আসিয়াছিল।

অক্ষয়ের মনের মধ্যে যে বিষ জমা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন এখন ফেনাইয়া তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

বাসায় যখন আসিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। নিঃশব্দে সে তাহার ঘরের তালা খুলিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে সে আর হোটেলে খাইতে গেল না। সেই একঘেয়ে তিন পয়সার ভাত, এক পয়সার

দাল, দু'পয়সার ঝোল, এক পয়সার ভাজা। তাহার অরুচি ধরিয়া গিয়াছে। এ-সব কিছুই আর তাহার ভাল লাগিতেছে না। প্রায় বছর ঘুরিয়া আসিতে চলিল, তবু এখানকার কোন কিছুই তাহার মনের উপর এক বিন্দু রেখাপাত করিতে পারিল না। দীর্ঘদিনের মেলা-মেশাতেও এখানকার সহিত তাহার কোনই পরিচয় ঘটিল না।

অনাহারে ভাবিতে ভাবিতে এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন একটু বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া, দরজার খিল খুলিতেই সে দেখিল, উঠানে পুলিসের লোকে ভরিয়া গিয়াছে এবং ওদিক্‌কার ঘরের কালীচরণ হাত-কড়া-বাঁধা হাত তুলিয়া তাহার দিকে দেখাইয়া দারোগাকে বলিতেছে,——"ঐ।"

হঠাৎ এই ব্যাপারটায় অক্ষয় থতমত খাইয়া গেল এবং এসম্বন্ধে কিছু ভাবিবার পূর্ব্বেই পুলিসের একজন কনেষ্টবল অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল!

৫

ব্যাপারটা একটা চুরি-সংক্রান্ত। কতকগুলি চোরাই মাল কালীচরণের ঘর হইতে বাহির হয়। কালীচরণ নিজেকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে পুলিসের কাছে বলে যে, সে কিছুই জানে না, জিনিষগুলি অক্ষয় ঘরে রাখিয়া দিয়াছিল।

বস্তুতপক্ষে অক্ষয় ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না কিন্তু এ ব্যাপারের সহিত তাহার নাম জড়িত হওয়াতে পুলিস তাহাকে ছাড়িল না। কালীচরণের সহিত তাহাকেও চালান দিল। অক্ষয়ের হাতে এক কপর্দ্দকও সংস্থান ছিল না। সুতরাং আপন পক্ষসমর্থন করিবার জন্য সে কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিল না। অধিকন্তু তাহার মুদীখানাদোকানের মনিব সেই রাখালদাস তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্যদান করিল। সুতরাং, নির্দ্দোষ হইলেও প্রমাণের অভাবে তাহার অব্যাহতিলাভ ঘটিল না। কালীচরণের অবশ্য গুরু শাস্তি হইল। সেই সঙ্গে সাহায্যকারী বলিয়া তাহারও আড়াই মাস জেল হইল।

আড়াই মাস পরে যে দিন প্রভাতে আলিপুরের

জেল হইতে সে বাহির হইল, সে দিন পূজার সপ্তমী।

হাতে পয়সা নাই, দেহে বল নাই, মনে শান্তি নাই। মাণিকতলার বাসায় সে আর যাইবে না। তাহার জামা, কাপড়, বিছানা? চুলায় যাউক! সে এক পা এক পা করিয়া ভবানীপুরের দিকে অগ্রসর হইল। কোথায় এখন সে একটু আশ্রয় পায়? আশ্রয়, আর দু'টি ভাত? শুধু আজকার দিনের জন্য। কালকার ভাবনা সে আজ আর করিতে চায় না। শুধু—শুধু আজ!

একটি বাটীর সম্মুখের রোয়াকের উপর কয়েকটি বাবু বসিয়া পরস্পর হাসি-তামাসা, গল্প করিতেছিল। একজন কহিলেন,—ইলিসমাছের কি আমদানীটাই হয়েছে!

আর একজন কহিলেন,—ওদিকে লোভ ক'রো না হে মন্মথ, জিনিষটি যেমন মুখরোচক, তেমনই পেট গরম করবার গুরুমশাই।

আচ্ছা, ভগবানের কি উল্টো বিচার! অত গভীর জলের ভেতর থাকে, ও খেলে হয় পেট গরম; আর ত্রিশূন্যে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যে থাকে ডাবের কাঁদি—
—তিনি হলেন কি না ঠাণ্ডা!—ও মশাই! মাছটা কত হ'ল?

বাঁজার হইতে একটি লোক হাতে একটা ইলিস ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। লোকটি কহিল,—ছ' আনা, মশাই। দামের কথা বলিতে বলিতে মুখ ব্যথা হয়ে গেল। এইটুকুর ভেতর কত লোক যে জিজ্ঞাসা করলে!

তখন বাবু কয়টির মধ্যে ইলিস সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতে লাগিল এবং আলোচনান্তে এই তথ্যটিই প্রকাশ পাইল যে, বাজার হইতে অন্য মাছ হাতে করিয়া ঝুলাইয়া আনা হউক, সে দিকে কেহ লক্ষ্যও করিবে না বা কোন প্রশ্নও করিবে না। কিন্তু একটা ইলিস হাতে ঝুলাইয়া আনিলেই হাজার লোক তাহার দাম জিজ্ঞাসা করিবে।

আচ্ছা, মন্মথ, তোমায় পাঁচ টাকা দেবো, তুমি যদি—

মন্মথ কহিল,—আমি যদি কি—বল?

বাজার থেকে একটা ইলিস কিনে আনবে। হাতে ঝুলিয়ে আনবে অবশ্য। কিন্তু কেউ তোমায় দামের কথা জিজ্ঞাসা করবে না।

মন্মথ বলিল,—অসম্ভব।

ঠিক এমনই সময়ে অক্ষয় সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল; ভাবিতেছিল,—একটু আশ্রয়, দু'টি ভাত! সে ফিরিয়া

দাঁড়াইল। বাবুদের কাছে আসিয়া কহিল, দেবেন পাঁচ টাকা।

বাবুরা রাজী হইল। এই স্থির হইল যে, তাঁহাদেরও একজন অক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। মাছটি প্রকাশ্য ভাবে হাতে ঝুলাইয়া আনিতে হইবে, অথচ একটি লোকও ডাকিয়া দামের কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।

অক্ষয় খানিক একটু কি ভাবিয়া স্বীকার করিল। পাঁচটা টাকা! পাঁচটা টাকা! পাঁচটা টাকাতে এখন তাহার অনেক উপকার হইবে!

তাহার হাতে মাছের দাম দেওয়া হইল। সঙ্গে মন্মথকে পাঠান হইল। বাজারে গিয়া অক্ষয় খুব বড় দেখিয়া একটা ইলিস কিনিল। তারপর সেটা হাতে ঝুলাইয়া ক্রন্দনের ছলে চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল।—ওরে বাপধন্ রে! ওরে তুই কোথা গেলি রে বাবা! ওরে তোকে ছেড়ে কি ক'রে আমার দুঃখের দিন কাটবে রে—রে—রে—রে!

সারাপথ ঐরূপে একইভাবে সে চীৎকার করিতে করিতে আসিল। কেহ তাহার মাছের দিকে তাকাইল না। কেহ তাহাকে দামের কথা জিজ্ঞাসা করিল না

রাস্তার দুই পার্শ্বের লোক বিস্ময়ে ও ঔৎসুক্যের সহিত তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

বাজী জিত হইল।

অক্ষয়কে তারিফ করিয়া বাবুরা বাজীর টাকা দিয়া কহিলেন,—বাহাদুরী আছে বটে তোমার। তা এত বড় মাছটা যখন তোমার হাত দিয়েই এলো, তখন এরই দু'চার খানা ভাজা দিয়ে দু'টি ভাত আজ আমাদের এখানে খেয়ে যেতে হচ্ছে হে তোমায়। পূজোর প্রথম দিনটায় একটু আমোদ আহ্লাদ—

—আজ কি প্রথম পূজো? সপ্তমী?

হ্যাঁ।

অক্ষয় আর দাঁড়াইল না। টাকা পাঁচটী ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং বড় রাস্তায় আসিয়া হাওড়ার বাসে উঠিয়া পড়িল।

* * *

শেষ ঘণ্টা দিয়া বেলা ১১টা ১৪ মিনিটের বর্দ্ধমান লোকাল ধীরে ধীরে হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম ত্যাগ করিল।

অক্ষয় যোড়হাত মাথায় ঠেকাইয়া মনে মনে নিবেদন জানাইল মা গো, আজকের দিনেই অভিমান ক'রে গাঁ

ছেড়ে চ'লে এসেছিলুম, আজকের দিনেই আবার গাঁয়ের কোলে ফিরে যাচ্ছি। এক বছর ধ'রে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভাল করেই করলুম। গাঁ ছেড়ে চ'লে আসার সেই পাপের যেন এইখানেই শেষ হয়, জননি!

সেই অবস্থায় সে যেন স্পষ্টই দেখিল, তাহার মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে, জগজ্জননী দশভুজার করুণার মূর্ত্তিখানি অপূর্ব্ব হইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে।

তাহার শীর্ণ মুখের উপর গভীর প্রসন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

আসল-নকল

১

তেল পাঁচ ছটাক্, গুড় আড়াইপো।

হ্যারিকেনের পল্‌তে দু'পয়সা।

বঙ্গলক্ষ্মীর ৯ হাত ৪২ ইঞ্চি——

বেদানা কত ক'রে, বলবে না ত, গোবর্দ্ধন?

অ নিতাই, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বো? চা-চিনি এক পয়সা। দেবে ত দাও, নইলে রক্ষিতদের দোকানে——

সন্ধ্যার ঝোঁকটায় মিত্রদের নূতন দোকানে ভীড় জমিয়া গিয়াছিল। গোবর্দ্ধন, নিতাই ও হরেকৃষ্ণ তিন জনে দিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। যে দুই হাতে নিমেষমধ্যে দশ জন খরিদ্দারকে বিদায় করে, সেই গদাধর ঘোষ আজ এ বেলা গরহাজির—দোকানে আসে নাই।

দোকানের মালিক প্রেমময় মিত্র দূরে একধারে গদীতে বসিয়া পার্শ্বস্থ বড় একটা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাক্সের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে খরিদ্দারগণের কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে সেই দিকে তাহার সোনার চশমা-আঁটা চোখের দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছিল।

বিগত বৎসর পর্য্যন্তও প্রেমময় কলিকাতায় ছিল। 'টমাস ব্লুবার্ড' কোম্পানীর আফিসে দুপুরবেলা চাকরী করিত এবং সকাল-সন্ধ্যায় বাসার বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধুবর্গের সহিত চা-পান করিতে করিতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, কংগ্রেস, বিলাতী বর্জ্জন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করিত। অবশেষে হঠাৎ একদিন ব্লুবার্ড তাহার পক্ষ গুটাইয়া অদৃশ্য হইলেন। তাহার বড় সাহেব, মেজো সাহেব, ছোট সাহেব অষ্ট্রেলিয়ার ব্রাঞ্চে গিয়া ভর করিলেন। সেজো এবং ন' অন্যত্র সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আফিসের কেরাণীবাবুদের মধ্যে কেহ ডাইং ক্লিনিং, কেহ অর্ডার সাপ্লাই, কেহ ইন্স্যুরেন্সের এজেণ্ট, কেহ বা বাইওকেমিক ডাক্তারী কেহ বা রয়েল রেঁস্তোর সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া—চা, কাটলেট, আমলেট, চপের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন।

প্রেমময় কোন দিকে কোন সুবিধা দেখিতে না পাইয়া দেশেই ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া বৃহৎ দোকানের পত্তন করিয়াছিল। তাহার মতলব ছিল, গ্রামের খরিদ্দার-গণকে সে আর কোন দোকানেই যাইতে দিবে না। সুতরাং গ্রামের সর্ব্বশ্রেণী লোকের সকল প্রকার আবশ্যকের জিনিষ সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে গিয়া দোকানটি তাহাকে বৃহৎই করিতে হইয়াছিল। তেল, নুণ, আটা, ময়দা, ঘি হইতে আরম্ভ করিয়া মশলা-পত্র, নারিকেল-কাতা, হুক্, পেরেক, আলকাতরা, কাগজ, পেনসিল, ষ্টেশনারী, জামা, কাপড়, ছাতা, লাঠি, গামছা, তোয়ালে, চা, বিস্কুট, লজেঞ্জ, এমন কি, ন্যাসপাতি, বেদানা, পেস্তা, কিস্‌মিস কিছুই বাদ যায় নাই। এ সব ছাড়া দাদের ঔষধ, জ্বর-হুতাশন, অজীর্ণারি প্রভৃতি পেটেণ্ট ঔষধের এবং পবিত্র সোডা, লিলি-সু-পালিশ, হাতে-কাটা পৈতা প্রভৃতির ও হাতে-লেখা ছোট ছোট শো-কার্ড তাহার দোকানে সর্ব্বত্র ঝুলিত।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে ক্রেতার ভীড় কমিয়া গেলে প্রেমময় তাহার সোনার ফ্রেমের চশমা এ দিকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—গদার আবার এ বেলা হ'ল কি?

ব্যাটার কামাইয়ের জ্বালায় অস্থির। গোবরা, কিছু জানিস তার খবর ?

গোবর্দ্ধন একজনের দোক্তাপাতা ওজন করিতে-করিতে দাঁড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, বোধ হয়, ধান-টান ঝাড়া নিয়ে——

কিচ্ছু না—কিচ্ছু না: নিশ্চয়ই বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করেছে বেটা।

মুহূর্ত্তখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া প্রেমময় আপন মনে অনুচ্চস্বরে কহিতে লাগিল,—ছোটলোক! স্ত্রীর মর্য্যাদাও জানে না, মান-সম্ভ্রমও রাখে না! বাঁদী ভেবে, অহোরাত্তির খাটিয়ে নিয়ে দু'বেলা এখন দুটি ভাত দিচ্ছে, তার পর ম'রে গেলে দুদিন একটু হা-হুতোশ করবে, তার পর আর একটাকে আবার হাসতে হাসতে ঘরে এনে ঢোকাবে!—

অন্যদিকে এই সময়টাতে গদাই বাগ্‌দীপাড়ার হরি-সভার মজলিসে আসিয়া এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া-ছিল। ঝগড়াই হইয়াছিল বটে, নচেৎ, হরিসভায় সে বড় একটা আসিত না। এ-বেলা দোকানে আসিবার কিছু আগেই কি একটা তুচ্ছ কথা লইয়া স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে উচ্চ কথা-কাটাকাটি ও পরে তাহা হইতে তুমুল কলহ

হইয়া যাইবার পর, রাগের মাথায় সে হাতের হুঁকাটা উঠানে আছড়াইয়া ফেলিয়া এইখানেই আসিয়া একধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

রাত্রিতে দোকান বন্ধ করিয়া প্রেমময় গৃহে আসিলে, স্ত্রী ঝিনুকরাণী পাখা হাতে লইয়া সম্মুখে আসিয়া বসিল। বাতাস করিতে বারণ করিয়া প্রেমময় স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—ও কাজটা তোমার নয়, ঝিন্‌কু!

ঝিনুক মৃদু হাসিয়া কহিল,—তবে আর একজন কেউ কোথাও আছে না কি?

রহস্য-হিসেবেও ও কথাটা তুমি বোলো না, ঝিন্‌কু! ক্ষোভের একটি শ্বাস প্রেমময়ের অন্তর হইতে বাহির হইল।

ঝিনুক কহিল, এক স্বামীর দুই স্ত্রী থাক্‌লে কি হয়?

নাঃ, কি হবে?

ঝিনুক স্বামীকে জানিত, তাই দুষ্টামী করিয়া এই স্থানটিতে সে একটু নাড়া দিল। স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আমি জ্যান্ত থাক্‌তে অবশ্য করতে বলি না, কিন্তু ম'রে গেলে তুমি আর একটা বিয়ে বোরো। করবে ত?

হ্যাঁ, তা ত করতেই হবে।

সত্যি, কোরো তা হ'লে।

করব, ঝিন্‌কু! কিন্তু এ সব কথা বলে আমার মনে ব্যথা দিতে তুমি কি ভালবাস?

ব্যথা তুমি নাও কেন? আমি কি তোমাকে জানি না? যুগ-যুগান্তর ধরে তপস্যা করেছিলুম, তাই তোমায় আমি পেয়েছি।

তুমিই শুধু আমাকে পেয়েছ? আমি তোমাকে পাই নি? দুজনেই দুজনকে পেয়েছি ঝিন্‌কু! যুগ-যুগান্তর ধরে দুজনেই ছিলুম, দুজনেই থাক্‌বো। এ তত্ত্ব ত তোমাকে কত দিন বুঝিয়েছি।

ইহার পর উভয়েই নীরবে বসিয়া রহিল। উভয়েরই অন্তর পরিপূর্ণ। চোখে-মুখে গভীর পরিতৃপ্তি ও প্রসন্নতার অপূর্ব্ব উল্লাস।

ঝিন্‌কু!

কি বলছ?

তুমি কি সুন্দর!

যত সব বাজে কথা তোমার। রাত হয়েছে, খাবে-দাবে কখন্?

খাওয়া-দাওয়াই কি সব চেয়ে বড়, ঝিন্‌কু?

বসে বসে বাজে কথা বলাই কি সব চেয়ে বড়?

সত্যই তুমি অমূল্য রত্ন। রত্নাকরের অমূল্য সম্পদ-রাজির শ্রেষ্ঠ রত্ন তুমি, ঝিনুকু! জীবন আমার সার্থক যে, তোমাকে আমি পেয়েছি—আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে, আমার সহধর্ম্মিণীরূপে, আমার সহকর্ম্মিণীরূপে।

ঝিনুকের গর্ব্বোদ্দীপ্ত মুখের উপর রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল।

২

দিন পাঁচ সাত পরে একদিন বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় গদাই দোকান হইতে গৃহে ফিরিয়া, দাওয়ার খুঁটীতে বাঁধা ছাগলের শূন্য দড়িগাছটা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কালোকে কি ছেড়ে দিয়েছিস না কি ?

কথাটা শুনিয়াও কদম কোন জবাব দিল না। গদাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—কালোকে কি পুকুর গাবায় বেঁধে এসেছিস ?

এবার কদম জবাব না দিয়া আর পারিল না, কহিল —না।

তবে ?

পাইকের এসেছিল, বিক্রী ক'রে দিয়েছি।

পাইকের এসেছিল, বিক্রী ক'রে দিয়েছিস ? বলিয়া গদাই দাওয়ার একধারে উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়া কদমের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

'কালো' ছাগলটিকে বাচ্ছাবেলায় গদাই কোথা হইতে আনিয়াছিল এবং এই তিন বৎসরকাল কদম তাহার ঘাস-জল যোগাইয়া তাহাকে বড় করিয়াছিল। কিন্তু অল্প

কয়দিন হইল, গদাই ভিতর ভিতর যে কালোর জন্য অন্য একটি সুব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা কদম কিছু জানিত না। নাগেদের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে, তাহাদের একটা আসন্ন 'ফিষ্টের' উপলক্ষে গদাইয়ের সহিত আঠারো সিকায় যে কালোর দেহ বিক্রয়ের কন্ট্রাক্ট পাকা হইয়া গিয়াছিল, সে কথা গদাই কদমের কাছে কোন দিনই প্রকাশ করে নাই। এ দিকে আজ সকালে গদাই দোকানে বাহির হইয়া গেলে পর পাড়ায় একজন পাইকার আসিয়াছিল এবং কদম পাঁচ টাকাতে কালোকে তাহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল।

মিনিটখানেক চুপ করিয়া কদমের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর গদাই জিজ্ঞাসা করিল,—কত কে বেচলি?

ঘরের ভিতর কি একটা কাজ করিতে করিতে কদম কহিল, পনর সিকে।

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে গদাই ঘরের ভিতরের দিকে চাহিয়া কহিল, পনের সিকে?

হ্যাঁ। তাই দিতে চায় না কি? কত ক'রে তবে—

বিষম গর্জ্জাইয়া উঠিয়া গদাই কহিল, কে তোকে বেচতে বলেছিল শুনি? তুই যেখান থেকে পারিস

আমার ছাগল হাজির করে এনে দিবি, নইলে তারই ঐ দড়িতে তোকে আমি বাঁধবো।

তুই এক কথায় গদাই ও কদমে তুমুল একটা ঝগড়া হইয়া গেল। উঠানে কদমের একখানা কাপড় শুকাইতেছিল। গদাই কুটি-কুটি করিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। কদম কুলের একটু ভক্ত, আচার করিবে বলিয়া দাওয়ার উপর কুলাতে করিয়া কুল রৌদ্রে দিয়াছিল। গদাই পায়ে করিয়া সেগুলিকে ছাঁচতলায়, উঠানে, আস্তাকুঁড়ে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। আগড়ের বাঁশখানা দিয়া কালোর ফ্যান খাইবার ডাবাটা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিল। তাহার পর উচ্চকণ্ঠে কদমকে গালি দিতে দিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, ফিরে এসে যেন দেখি, তুই মরেছিস, কদমী! তা হলে তুইও জুড়ুবি, আমিও জুড়োব। কদমও ঘরের ভিতর হইতে উচ্চকণ্ঠে কহিল,—তাই জুড়ুস মিন্‌ষে। আমার চিতের আগুনে তোর বুকের আগুন যেন নেবে। নোয়াপাড়ার তুষ্টু গয়লার ভাইঝীর ওপর টান পড়েছে তা কি আমি আর বুঝতে পারি না? মরবার অপিক্ষেই বা কচ্ছিস কেন, আমি থাকতে-থাকতেই নিয়ে আয় না, সুখের সংসারটা তবু একবার দেখে যাই।

সে দিনের রাঁধা ভাত-তরকারি হাঁড়িতেই শুকাইতে লাগিল, কাহারও ভাগ্যেই তাহা জুটিল না। সারাদিন 'কদম দাওয়ার একধারে চেটাই বিছাইয়া পড়িয়া রহিল। না কিছু খাইল, না একবার উঠিল। তাহার পক্ষে এ ব্যবস্থা যে নূতন, তাহাও নহে। সাত বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, এখন সে যৌবন অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। সুদীর্ঘ দিনের অবকাশে ও অভ্যাসে এ সব তাহার সহিয়া গিয়াছিল। এর জন্য তাহার বিশেষ দুঃখও নাই, অনুতাপও নাই, ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই। বরং সারা বেলা শুইয়া থাকিয়া ইহাই সে মনে মনে স্থির করিল যে, ছাগল-বিক্রীর টাকা সে কিছুতেই গদাইয়ের হাতে দিবে না, উহা সে তাহার নথ গড়াইবার জন্য মাহিন্দির স্যাকরার কাছে গোপনে জমা রাখিয়া আসিবে।

গদাইও সে দিন দোকানে গেল না। নদীর সাঁকোর কাছে বড় আঁসফল-গাছের তলায় সাঁওতালদের যে মুরগীর লড়াই হইতেছিল, খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাই দেখিয়া সে নোয়াপাড়ার তুষ্টু গোয়ালার গৃহের উদ্দেশে নদীর সাঁকো পার হইয়া চলিয়া গেল।

প্রেমময় সে দিনও গোবর্দ্ধনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,

গদা বেটা আজও তা হলে ঝগড়া ঝাঁটি করেছে ঠিক। ওকে নিয়ে মহা-মুস্কিল হ'ল দেখছি!

নিতাই কহিল, বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া ত ওর রোজই, বাবু!

এই সময় গ্রামের কয়েকটি মাতব্বর ভদ্রলোক দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামের মেয়ে-স্কুলটির সম্পর্কেই ইঁহারা আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে স্কুলটি যে-স্থানে অবস্থিত আছে, সেখানে স্থান-সঙ্কুলানও হয় না, অন্যান্য অসুবিধাও অনেক আছে। প্রেমময়ের দোকানের সম্মুখে, পথের ও-পাশে প্রাচীর-বেষ্টিত দুইখানি প্রশস্ত টীনের ঘর ছিল। ইহা প্রেমময়েরই সম্পত্তি। প্রেমময় ইঁহাদের কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল যে, স্কুল তাহার ঐ বাটীতেই বসুক, উহা সে চিরকালের জন্য স্কুলকে দান করিয়া দিতেছে। তবে স্কুলের নাম রাখা হউক 'ঝিনুক বালিকা-বিদ্যালয়'। এই কার্য্যের পাকাপাকি ব্যবস্থার জন্যই আজ সকলে আসিয়াছিলেন। প্রেমময়ের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া এই সব কথা হইয়া বন্দোবস্ত পাকা হইয়া গেল। দানপত্র রেজেষ্ট্রীর কথায় প্রেমময় কহিল, তার কোনই আবশ্যক হবে না। আমার স্ত্রীর নামে দিলুম, সুতরাং মুখের কথাই আমার রেজেষ্ট্রীর চাইতে বেশী।

ইহার উপর আর কেহ কিছু বলিলেন না। অতঃপর স্কুল উঠাইয়া আনিবার ব্যবস্থাই ঠিক হইয়া গেল।

রাত্রিতে গৃহে ফিরিয়া প্রেমময় ঝিনুককে কহিল, বাড়ীটা স্কুলের জন্যে দিয়ে দিলুম ঝিনুক। তোমার নামেই স্কুলের নাম হবে।

তা হলে, আমি ম'রে গেলেও আমার নামটা থেকে যাবে।

তা থাকবে। কিন্তু ও-কথাটা আমায় শুনিও না, ঝিনুক!

কোন্ কথাটা?

একটু ব্যথার স্বরে প্রেমময় কহিল, আমি জানি না।

অল্প একটু হাসিয়া ঝিনুক কহিল, ম'রে যাওয়ার কথাটা? তা, আমি কি কখনই মরব না, বলতে চাও?

না, আমি কিছুই বলতে চাই না। তবে, তুমি ম'রে যাবার পর আমিই যে বেঁচে——কিন্তু এ সব কথা তুমি কেন বল, ঝিনুক!

প্রেমময়ের সুদীর্ঘ একটি নিশ্বাসে ঘরের বায়ু স্তব্ধ ও ভারী হইয়া পড়িল।

৩ ।

একদিন বৈশাখের বেলা-শেষে কদম জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে অদূরের সাম্‌তা-পুকুর হইতে এক ঘড়া খাবার জল আনিতে যাইতেছিল। ঘরে এক বিন্দু জল ছিল না। যে-টুকু ছিল, তাহা সে সারাদিনের জ্বরের প্রবল তৃষ্ণায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিল।

তখন জ্বর ছাড়িয়া আসিতেছিল। পরনের মোটা কাপড়খানা সর্ব্বাঙ্গে ভাল করিয়া জড়াইয়া শূন্য পিতলের কলসী কাঁখে করিয়া কদম চলিতে চলিতে হঠাৎ পথের এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। ও-গাঁয়ের দিক্ হইতে কাহাদের একটা মড়া নদীর ধারের দিকে লইয়া আসিতেছিল। সঙ্কীর্ণ পথটির একপার্শ্বে শিয়াকুল-কাঁটার ঝাড়। পাশ ঘেঁসিয়া সেইদিকে সরিয়া দাঁড়াইলেও কদমের মনে হইল, যেন তাহাদের এক জনের গায়ের কাপড় তাহার গায়ে আসিয়া ঠেকিল। নিকটেই কুমোরদের ন'গিন্নী দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, কদম, এই অ-বেলায় ছোঁয়াচ পড়লি মা, একটা ডুব দিয়ে আসিস অমনি।

কদম আর উপায়ান্তর দেখিল না। অগত্যা সেই

সন্ধ্যাবেলা জ্বরের উপরই কাঁপিতে কাঁপিতে তিনটি ডুব দিয়া সে জলের ঘড়া কাঁখে করিয়া ঘরে ফিরিল।

সেই রাত্রিতেই কদমের জ্বর ভিন্নমূর্ত্তিতে দেখা দিল। সমস্ত রাত্রি জ্বরের তাড়নায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইল। তাহার পর দুই দিনের মধ্যে তাহার যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইল, তাহাতে গদাই ভয় পাইয়া গ্রামের ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া ও সমস্ত শুনিয়া তাহার বিকৃত মুখখানা অন্যদিকে ফিরাইল।

যথাসময়ে প্রেমময় কদমের অসুখের কথা শুনিল। গদাইকে ডাকাইয়া কহিল, রোগ শক্ত হয়ে পড়েছে, বাঁচবার আশা নেই। ভাল ক'রে চিকিৎসে-পত্তর কর্। দোকানে আসিয়া গোবর্দ্ধনকে কহিল, গদা বেটার মনোবাঞ্ছা এইবার হয়ত পূর্ণ হবে। বেটা ভারী পাষণ্ড! বৌটাকে দুচোখে দেখতে পারত না। এইবার ওটা মলে ও-ব্যাটার পোয়া-বার হবে!

নোয়াপাড়ার তুষ্টু গোয়ালার ভাইঝির কথাটা প্রেমময়ও শুনিয়াছিল। মনে মনে ভাবিল, এইবার সেটাকে বিয়ে ক'রে ঘরে এনে ঢোকাবার সুবিধে হবে। এই সব ছোট জাতের কিছুই ত বাধে না। স্ত্রী ম'রে

গেলে যে আর স্ত্রী হয় না, সে শিক্ষা ত এরা পায় নি!

মনে মনে এই আলোচনা করিতে গিয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখে হঠাৎ ঝিনুকের শান্ত-সৌন্দর্য্যভরা প্রস্ফুটিত মুখ-কমল ফুটিয়া উঠিল। কি একটা অজানা আতঙ্কে তাহার অন্তর সহসা কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সোজা হইয়া বসিয়া মনের গতিকে শক্ত করিয়া ঘুরাইয়া দিয়া দোকানের বেচা-কেনার মধ্যে ছাড়িয়া দিল।

সে দিন দোকানের কাজ-কর্ম্ম তাহার মোটেই ভাল লাগিল না; সকাল সকালই প্রেমময় গৃহে ফিরিয়া গেল।

ঝিনুক কাছে আসিয়া কহিল, আজ এরই মধ্যে এলে?

শরীরটা আজ ভাল নেই, ঝিনকু।

অপরিসীম উদ্বেগের সহিত ঝিনুক জিজ্ঞাসা করিল, ভাল নেই! কি হয়েছে?

বিশেষ কিছু হয় নি; যেটুকু হয়েছিল, তা তোমাকে সামনে দেখেই সেরে গিয়েছে।

তত্রাচ ঝিনুক ব্যস্ত হইয়া স্বামীর গায়ে কপালে হাত দিয়া দেখিল।

প্রেমময় ঝিনুকের হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া কহিল, ঝিনকু!

কি বলছ ?

নাঃ—থাক্।

না, থাকবে কেন.—কি বল ?

নাঃ—সে অন্য কিছু। আচ্ছা, ঝিন্কু ?

কি ?

তুমি চকা-চকীর কথা শুনেছ ?

না, বলবে ?

আচ্ছা, বোলবো একদিন।

ঝিনুক কি একটা কাজ করিতে করিতে চলিয়া আসিয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইতেই প্রেমময় কহিল, কি করবে এখন ? আমার কাছে একটু বসবে না ?

ঝিনুক কি বলিতে যাইতেছিল, প্রেমময় কহিল,—আচ্ছা, যাও।—দেখ,—না, থাক্।

ধীরপদে ঝিনুক ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল

৪

ক্রমান্বয়ে তের দিন ধরিয়া প্রতিনিয়ত ডাক্তার কদমকে দেখিতে আসার পর আর আসিল না। কারণ, তাহার চিকিৎসার চৌদ্দ দিনের দিন, কদম তাহার ঔষধকে তুচ্ছ করিয়া চলিয়া গেল।

মৃত্যুসময়ে কদমের পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তবে বেশী কিছু কথা সে বলে নাই। শুধু এক সময়ে গদাইকে নিরিবিলি পাইয়া কহিয়াছিল, তোমার একটু পায়ের ধূলো আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দাও। যন্ত্রচালিতের মত গদাই কদমের শেষ কামনা পূর্ণ করিয়াছিল। ইহার কিছু পরেই বাহির হইতে কাহারা ঘরের ভিতর আসিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কদম তাহার ক্লান্ত আঁখি মুদ্রিত করিয়াছিল, আর চাহে নাই।

গদাইয়ের চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইল না, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল না, এক দণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল না। তখনই উঠিয়া, উৎসাহে কোমর বাঁধিয়া সে কাঠের যোগাড়ে বাহির হইল এবং কাঠ সংগ্রহ হইলে, জন কয়েক স্বজাতীয়ের সাহায্যে কদমকে

নদীর ধারের শ্মশানে আনিয়া তাহার শেষকৃত্য সম্পন্ন করিল।

একজন প্রবোধ দিবার ছলে শ্মশানেতেই কহিল, এই বিধির বিধি ভাই, মন খারাপ ক'রে আর কি করবি বল্!

গদাই কোমরের কাপড়টা আঁটিতে আঁটিতে কহিল—মন খারাপ, না. ইয়ে! পায়ের দিকটা এখনো বুঝি পোড়ে নি,—না?

ঘরে ফিরিলে পাড়ার মেয়েদের কে একজন বলিল, পুণ্যবতী! সিঁথের সিঁদুর বজায় রেখে চ'লে গেল। তুমি আর কিছু দুর্ভাবনা ভেবো না, গদাইদা।

চালের আড়ার দিকে অনুসন্ধানচ্ছলে এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে গদাই কহিল—দুর্ভাবনা ভাববার জন্যে আমার বোয়ে যাচ্ছে! তার কথা ভাবলে ত আমার দিন যাবে না,—মাথার ওপর অত বড় একখান দোকান রয়েছে! বলিয়া শুধু শুধুই একবার রান্নার চালায়, একবার ঘরের পাদাড়ে, একবার খিড়কীর দিকে ঘুরিয়া আসিল।

কদমের মৃত্যুর পর যথাপূর্ব্ব গদাইয়ের দিন কাটিতে লাগিল এবং এক এক দিন করিয়া পর পর তিনটি সুদীর্ঘ মাস এই রকম করিয়াই কাটিয়া গেল।

না বাবু, শুধু শুধু ছুটি নিয়ে ব'সে থেকে কি করব বলুন। আপনি যেটা মনে মনে অনুপ্রাণ করেছেন, সেটা আমি বুঝতে পেয়েছি বাবু, কিন্তু প্রাণে আমার কোন কষ্ট নেই। শুধু—

প্রেমময় আর তাহাকে কিছু বলিল না।

এইভাবে আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। তখন বর্ষান্তে গ্রামের হাওয়ার মধ্যে আসন্ন পূজার গন্ধ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সকলেরই মনে উৎসাহ, আনন্দ, প্রীতি। এই সময় হঠাৎ এক দিন গদাই প্রেমময়ের কাছে আসিয়া বলিল, বাবু, না-হয় মাসখানেকের ছুটিই আমাকে দিন, একটু কোথা থেকে একবার ঘুরেফিরে আসি। অন্তর-করণটা বড্ড খাঁ খাঁ করছে, এখানে আর কিছুতেই টেঁকতে পারছি না।

ইহার দিন দুই পরে নিতাই একদিন গদাইকে চুপি চুপি কহিল, ছুটি যখন পেলি, অবিশ্যি কোথাও থেকে একটু ঘুরে-টুরে একবার আয়, কিন্তু এসে একটা বিয়ে-টিয়ে কর, কেননা, সংসারে ত আর কেউ নেই, বুঝছিস্ না? নোয়াপাড়ার ঠাকুর ভাইঝিটাকেই না হয়—

গদাই নীরবেই রহিল।

কোন উত্তর না পাইয়া নিতাই কহিল, কি বলিস?

তাই কর। খরচ-পত্তরের জন্যে ভাবিস নি, বাবু আছেন, আমরা আছি, এক রকম ক'রে ক'রে-কম্মে দেওয়া যাবে এখন। তবে ঝগড়া-ঝাঁটি আর করিস নি, গদাইখুড়ো।

হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া গদাই কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতেই কহিল, ঝগড়া করবার গলা সে যে ভেঙ্গে দিয়ে গেছে, নিতাই।

তা হ'লে আমি যা বলছি, তা করবি ?

চোখ মুছিতে মুছিতে গদাই কহিল, কি করলে কদমের কাছে যেতে পারি, তোরা খালি সেইটে আমায় ব'লে দে।

নিতাই নীরব রহিল।

নিতাইয়ের ন্যায় গ্রামের অনেকেই তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া বিবাহের কথা বলিয়াছিল, কিন্তু গদাইয়ের ভাব-গতিক দেখিয়া একে একে সকলেই নিরস্ত হইয়াছিল।



৫

এক মাসের ছুটি লইয়া গদাই এক বৎসরেরও অধিক-কাল বাহিরে কোথায় কাটাইয়া অগ্রহায়ণের এক শীতের দিনে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

ঘরে আসিয়া বড় একটা সে কোথাও আর বাহির হয় না। চব্বিশ ঘণ্টা সদরের আগড় বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যেই থাকে। সামতা-পুকুরে স্নান পর্য্যন্তও করিতে যায় না, খিড়কীর ডোবাতেই একটা ডুব দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসে। আগের মত খিড়কীর ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে হাঁসের সাঁতার-কাটা বা ও-পারের সেই সব ধান-ক্ষেতের দিকে সে আর চাহিয়া দেখে না। এখন এই সময়টায় গুচ্ছবদ্ধ সতেজ ধানের ঝাড়ে সম্মুখের সারা মাঠ সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। গুচ্ছে গুচ্ছে তাহার শীষ বাহির হইয়াছে। সামান্য বাতাসের আন্দোলনে বিস্তীর্ণ ক্ষেতের উপর দিয়া সবুজের অপূর্ব্ব তরঙ্গ খেলিয়া যায়। কিন্তু গদাই এ সকল আর কিছুই দেখে না, ঘরের বাহির হয় না। দুই চারি পয়সার জিনিষ কিনিবার আবশ্যক হইলে, পাড়ার ছেলেদের কাহাকেও ডাকাইয়া সে কাজ করিয়া লয়।